পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

কম্পিউটার শিখন ও শিক্ষণ

SCERT, WB

কম্পিউটার

শিখন ও শিক্ষণ

কম্পিউটার শিখন ও শিক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রকাশক :
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

গ্রন্থস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-937413-8-2

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা :
ড: ছন্দা রায়
ডিরেক্টর, এস. সি. ই. আর. টি
পশ্চিমবঙ্গ

সঞ্চালক :
ড. কে. এ. সাদাত ও নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড পাঠক্রমের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে এই ডিরেক্টরেট, সরকারি নির্দেশনামা 712-Edu (cs)/8T-17/79 তারিখ 21.05.1980 সেকশন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে ''Development of Teaching Clarity'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন—(১) ব্যবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি—এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ই আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ই আগস্ট, ২০১৫। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহ (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪শে আগস্ট ২০১৫ থেকে ২৮শে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি (CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট হাওড়াতে ৩১শে আগস্ট ২০১৫ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলি জোরালো ভাবে উঠে এসেছিল, তা হল—''ডি.এল.এড'' এর জন্য সঠিক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন।''

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনোরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট, বর্ধমানে ২০১৬ সালে জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল—''Instructional Material Design (development of teaching clarity) for Teaching Preparation.'' এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়েট, হুগলিতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা, সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায়—১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক-শিক্ষণে, তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরি ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের তথা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাইলট টেস্টিং-এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মাণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২রা মে ২০১৬ থেকে ৪ঠা মে ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং-এর অংশ হিসেবে একমাস ধরে রাজ্যে চারটি ডায়েটে কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় রাজ্যের প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করা হয় 'State Monitoring Team' দ্বারা।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলীর তত্ত্বাবধানে ৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ১০ই ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ কালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাঁদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তাঁরা হলেন— শ্রী মিলন কুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ডঃ স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী তপন কুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ডঃ সন্ধ্যা দাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং শ্রী পরিতোষ প্রামাণিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া। এই পুস্তকটি রচনায় বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন শুভদীপ মাইতি, শম্ভু সোম এবং সুজিত হালদার।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলী, ডঃ কে. এ. সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ডঃ বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে—যাঁরা শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও পাইলট টেস্টিং-এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি, কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস.সি.ই.আর.টি.কে—যাঁরা পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় এই প্রকল্প শুরু থেকেই একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ডঃ ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১	কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা (Basic Concepts of Computer)	১-১৩
অধ্যায় ২	কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম (Computer Operating System)	১৪-৩৭
অধ্যায় ৩	ওয়ার্ড প্রসেসিং (Word Processing)	৩৮-৫৫
অধ্যায় ৪	এম এস এক্সেল (MS Excel)	৫৬-৭৫
অধ্যায় ৫	শিক্ষন শিখন পদ্ধতিতে পাওয়ার পয়েন্ট (Power Point in Teaching Learning Process)	৭৬-৯১
অধ্যায় ৬	কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন (Computer Aided Learning)	৯২-১০৭
অধ্যায় ৭	ওয়েব ভিত্তিক শিখন (Web Based Learning)	১০৮-১২০
অধ্যায় ৮	কম্পিউটারের সুরক্ষা (Protection in Computer)	১২১-১২৫

অধ্যায়
১

কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা

১.১. সূচনা (Introduction)

Computer শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ "Compute" থেকে যার অর্থ গণনা করা। কিন্তু গণনাযন্ত্র হিসাবে Computer কে দেখলে এর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। সংজ্ঞা অনুসারে, কম্পিউটার বা গণকযন্ত্র হল ইলেকট্রনিক উপাদানে গঠিত একটি জটিল ইলেকট্রনিক সিস্টেম, যেটি নির্দেশ অনুসারে এক বা একাধিক তথ্য (data) থেকে ধাপে ধাপে যৌক্তিক, গাণিতিক ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতি দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যথার্থ ফলাফল (output) তৈরি করে। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার হল অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন একটি জটিল ইলেকট্রনিক সিস্টেম যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই সঠিক ডাটা সঠিকভাবে প্রসেস করে প্রয়োজনীয় ফলাফল তৈরি করে। একটি কম্পিউটার সিস্টেমের মূল কার্যাবলী হল ডাটা সংগ্রহ (input or data collection), ডাটা সংরক্ষণ (data storage), ডাটা প্রসেসিং (data processing) এবং প্রয়োজনীয় ফলাফল (output) তৈরি করা।

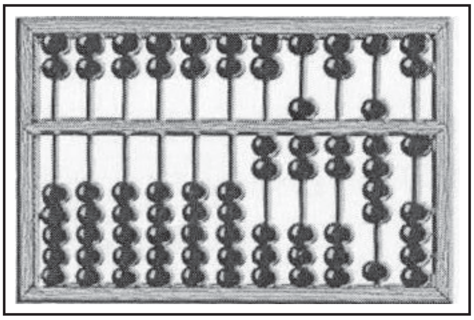

চিত্র ১.১: অ্যাবাকাস

কম্পিউটার হল বিংশ শতকের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সেরা আবিষ্কার। তবে কম্পিউটারের আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে বহু মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের নিরলস প্রচেষ্টা। প্রায় ৪০০০ বছর আগে চীন দেশের তৈরি 'Abacus' হল প্রথম গণনাকারী যন্ত্র। এর বহু যুগ পরে ১৬১৭ সালে জন নেপিয়ার একটি ভিন্ন ধরণের গণনাযন্ত্র আবিষ্কার করেন যার নাম নেপিয়ার বোন (Napier's Bone)। এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল উইলিয়াম ওট্রেট-এর Slide Rule। ১৬৪২ সালে ফরাসী গণিতবিদ ব্লেইজ পাস্কাল উন্নতমানের যে গণকযন্ত্রটি তৈরি করেন তার মাধ্যমে যোগ ও বিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যেত। তবে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক চালর্স ব্যাবেজই কম্পিউটারের প্রথম সংস্করণ তৈরি করেন। তিনিই ১৮২৩ সালে ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Difference Engine) নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেন যার মাধ্যমে গাণিতিক এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গণনা করা যেত। ১৮৩৭ সালে চালর্স ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি কর্মক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি যন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছিলেন, যেটি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন (Analytical Engine) নামে পরিচিত। এটিকেই বর্তমান আধুনিক কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ বলা হয়। বৈজ্ঞানিক চার্লস ব্যাবেজকেই আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

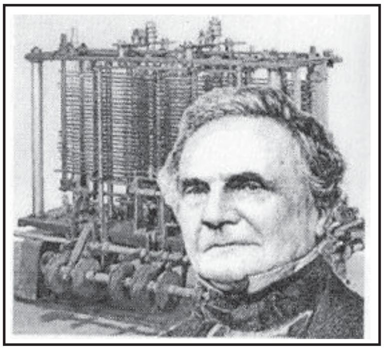

চিত্র ১.২: চার্লস ব্যাবেজ

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে সকল বিষয়ে অবগত হবে সেগুলি হল :

- একটি কম্পিউটারের গঠন ও তার বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী সম্পর্কে জানা যাবে।
- কম্পিউটার আবিষ্কারের ইতিহাস এবং বিভিন্ন প্রজন্মের কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- একটি কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য ও তার গঠনাবলী (configuration) সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।
- কম্পিউটারের সাধারণ কার্যাবলী ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানা যাবে।

১.২. কম্পিউটার আবিষ্কারের ইতিহাস (History of Evaluation of Computer)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ডঃ হারম্যান হলেরিথ (Dr. Herman Hollerith) এবং জেমস্ পাওয়ারস্ (James Powers) আমেরিকার জনগণনার কাজে ব্যবহারের জন্য সেনসাস্ মেশিন নামে একটি ডাটা প্রসেসিং মেশিন তৈরি করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে অ্যালফাবেটিক্যাল ও নিউমেরিক্যাল উভয় ধরণের তথ্যই বিশ্লেষণ করা যেত। ১৮৯৬ সালে এই যন্ত্র তৈরির জন্য Hollerith ''টেবুলেটিং'' মেশিন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে বিখ্যাত IBM (International Business Machine) কোম্পানীর জন্ম হয়। এরপর ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে তৈরি হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক Mark- I এবং এই বছরের শেষের দিকে তৈরি হয় প্রথম বৈদ্যুতিক ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) কম্পিউটার।

ENIAC আবিষ্কারের পর থেকে যে সকল কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং আবিষ্কারের সময়ের উপর নির্ভর করে তাদেরকে কয়েকটি প্রজন্মে (Generation) ভাগ করা হয়, যেমন প্রথম প্রজন্ম, দ্বিতীয় প্রজন্ম, তৃতীয় প্রজন্ম, চতুর্থ প্রজন্ম এবং পঞ্চম প্রজন্ম। বিভিন্ন প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

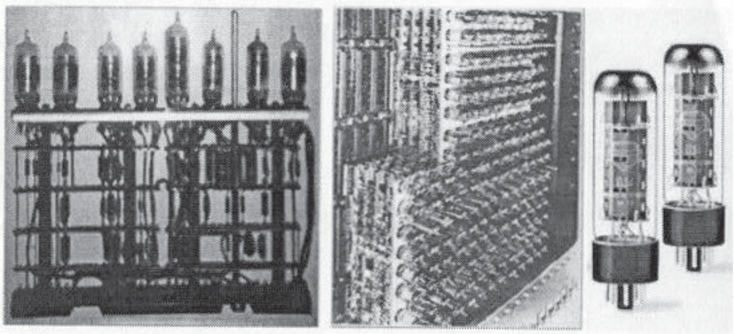

চিত্র ১.৩: প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার

প্রথম প্রজন্ম (১৯৪২-১৯৫৯)

এই প্রজন্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার হল - ENIAC, EDVAC, UNIAC-I, IBM 650 এবং IBM 701। এই প্রজন্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রধান উপাদান হিসাবে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হয়।
- যন্ত্রগুলি আকৃতিতে বৃহদাকার ছিল।
- প্রাইমারী মেমোরি হিসাবে ম্যাগনেটিক ড্রাম এবং সেকেন্ডারী মেমোরি হিসাবে ম্যাগনেটিক টেপের ব্যবহার করা হয়।
- এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলিতে প্রথমে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ (Machine Language) এবং পরে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ (Assembly Language) ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৫৯-১৯৬৫)

এই প্রজন্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার হল— IBM 1400, IBM 700 এবং HONEY WELL 200। বেল ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী বার্ডিন (Bardeen), ব্রাটেন (Brattain) এবং শক্‌লে (Shockley)—এর মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম ট্রানজিস্টার আবিষ্কার হয়। ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টার ব্যবহারের সময় থেকেই শুরু হয় কম্পিউটারের দ্বিতীয় প্রজন্ম। এই প্রজন্মের কম্পিউটারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রধান উপাদান হিসাবে ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়।
- এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলি আকারে প্রথম প্রজন্মের তুলনায় ছোটো আকারের ছিল।
- মেমোরি হিসাবে ম্যাগনেটিক কোর (core) ব্যবহার করা হয়।
- বিভিন্ন ধরনের হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (High Level Language) যেমন COBOL, BASIC, PL/1-এর ব্যবহার শুরু হয়।

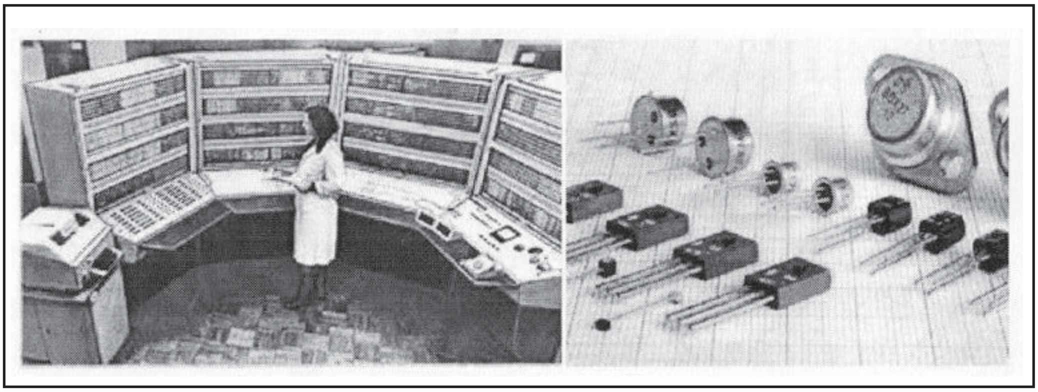

চিত্র ১.৪: দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার

তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬৫-১৯৭১)

এই প্রজন্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার হল—IBM SYSTEM-360, 370 এবং NCR395। IC বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আবিষ্কারের পরে এবং তা কম্পিউটারে ব্যবহারের মাধ্যমেই শুরু হয় কম্পিউটারের তৃতীয় প্রজন্ম। এই প্রজন্মের কম্পিউটারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

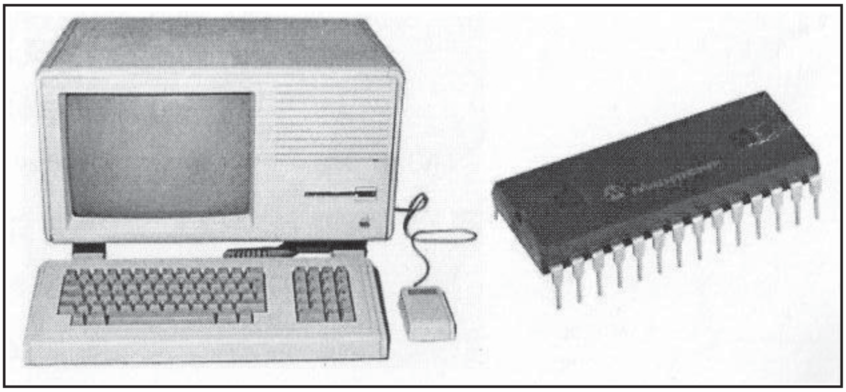

চিত্র ১.৫: তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার

- প্রধান উপাদান হিসাবে IC বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হয়।
- প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের থেকে এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলি আকারে অনেক ছোটো ছিল।
- ইনপুট মাধ্যম হিসাবে কী-বোর্ড এবং আউট পুট মাধ্যম হিসাবে মনিটরের ব্যবহার শুরু হয়।
- সেকেন্ডারী মেমোরি হিসাবে ম্যাগনেটিক ডিস্ক ব্যবহার করা হয়।
- PASCAL, FORTRAN ইত্যাদি High Level Language-গুলির ব্যবহার শুরু হয়।

চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭১-১৯৯৮)

এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলি হল - 3086, 30286, 30486 এবং পেন্টিয়াম। IC-এর পর LSI (Large Scale Integration) এবং VLSI (Very Large Scale Integration) ব্যবহারের শুরু থেকে কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্মের শুরু ধরা হয়। এই প্রজন্মের কম্পিউটারের সাধারণ

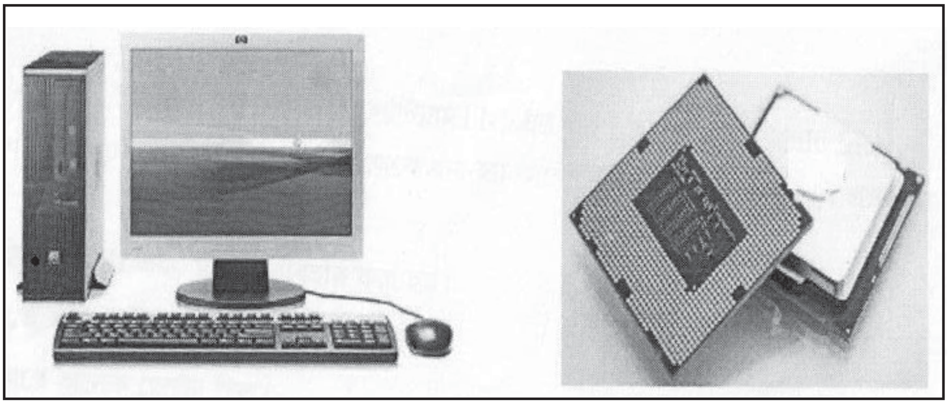

চিত্র ১.৬: চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার

বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- কম্পিউটারের মূল উপাদান হিসাবে LSI এবং VLSI ব্যবহার করা হয়।
- এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলিতে মাউস, প্রিন্টার এবং স্পিকারের ব্যবহার শুরু হয়।
- এই প্রজন্মের মেশিনগুলি অন্যান্য প্রজন্মের থেকে আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোটো।
- এই প্রজন্মের মেশিনগুলিতে অধিক storage ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাগনেটিক ডিস্ক, CD-ROM ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়।
- C, C++, Visual Basic ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ, Word Processing, Spread Sheet, Database এবং বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল প্যাকেজের (Package) সফল ব্যবহার শুরু হয় চতুর্থ প্রজন্ম থেকেই।

পঞ্চম প্রজন্ম (১৯৯৮-বর্তমান)

এই প্রজন্মে আরো অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) সম্পন্ন কম্পিউটার নিয়ে গবেষণা চলছে। এই প্রজন্মের কম্পিউটারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রধান উপাদান হিসাবে ULSIC (Ultra Large Scale Integrated Circuit) ব্যবহার করা হয়।
- এই প্রজন্মের মেশিনগুলিতে LCD এবং LED মনিটরের ব্যবহার শুরু হয়।
- এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলি আকারে এতই ছোটো যে সহজে বহনযোগ্য।
- Artifical intelligence-এর প্রয়োগে Intelligence programming উদ্ভাবন হয় এবং এই প্রজন্মের কম্পিউটারগুলিতে intelligence programming র ব্যবহার শুরু হয়।
- পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারগুলিতে অধিক স্টোরেজ ক্ষমতাসম্পন্ন Hard Disk-এর ব্যবহার শুরু হয়।

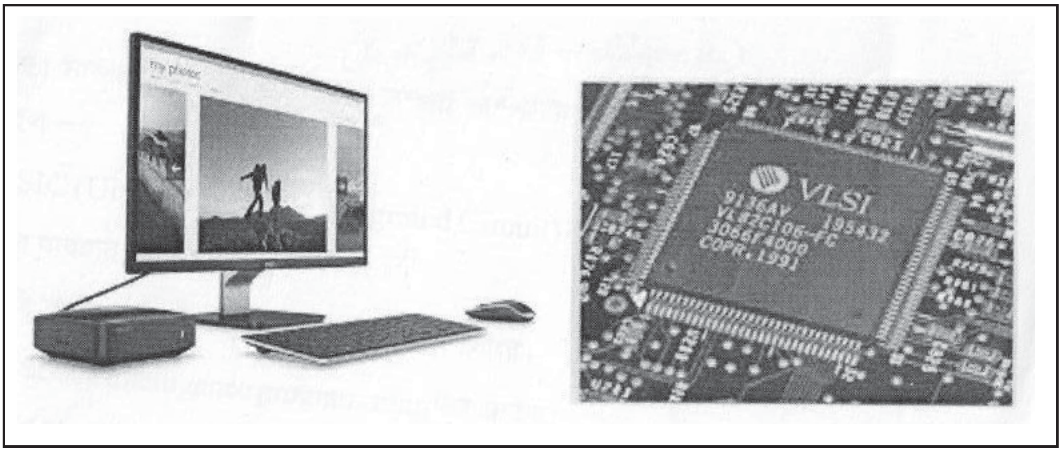

চিত্র ১.৭: পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার

১.৩. কম্পিউটারের সাধারণ কার্যাবলী (Common Functions of Computer)

একটি কম্পিউটার সিস্টেম বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলি সমবেতভাবে হার্ডওয়্যার নামে পরিচিত। এই যন্ত্রাংশগুলি হল প্রসেসর, মাদার বোর্ড, মনিটর, মেমোরি, ডিস্ক ড্রাইভার, কি-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি। এককভাবে কম্পিউটার সিস্টেমকে দেওয়া নির্দেশসমূহ এবং ডাটা বা তথ্যসমূহ যেগুলি চোখে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, সেগুলি হল সফটওয়্যার। সফটওয়্যার আসলে কম্পিউটার সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত লিখিত তথ্যাদি এবং নির্দেশাবলীর সেট যা প্রোগ্রাম (Program) নামেও পরিচিত। নিশ্চিতভাবে বলা যায়,

কম্পিউটার সিস্টেম হল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-এর সমন্বয়ে তৈরি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

কম্পিউটারের কাজকে সাধারণভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন —

- ডাটা সরবরাহ বা ইনপুট (Input)
- প্রসেসিং (Processing)
- ডাটা স্টোরেজ (Storage) এবং
- আউটপুট (Output)

নীচে এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইনপুট (Input) বা ডাটা সরবরাহ

যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাকেই ***ডাটা*** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটারের সাহায্যে দুই বা তার অধিক সংখ্যার গড় নির্ণয় করতে হলে সংখ্যাগুলিকে কম্পিউটারে ইনপুট (input) হিসাবে দিতে হবে। এই সংখ্যাগুলি হল ডাটা। ডাটা প্রসেসিং-এর (Processing) পর কম্পিউটার যে output তৈরি করে তাকে ***ইনফরমেশন (Information)*** বলা হয়। পূর্বের উদাহরণে সংখ্যাগুলি থেকে প্রাপ্ত গড়ই হল ইনফরমেশন এবং ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি হল ডাটা। কোনো একটি প্রসেসিং থেকে প্রাপ্ত ইনফরমেশন অন্য একটি প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে ডাটা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ইনপুটের অর্থ হল কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাসঙ্গিক ডাটা বা ইনফরমেশন কম্পিউটারকে সরবরাহ করা। অন্য কথায় বলা যায় কম্পিউটারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যে তথ্য কম্পিউটারকে দেওয়া হয় তাকেই ইনপুট বলা হয়। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে Mouse, Keyboard ইত্যাদি যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয়। এই কারণে এইগুলিকে ইনপুট ডিভাইস (Input device) বলা হয়।

প্রসেসিং (Processing)

এই পদ্ধতিতে ডাটা বা ইনফরমেশনগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে সাজানো হয় অথবা ডাটা বা ইনফরমেশনগুলিকে অন্য ডাটা বা ইনফরমেশনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত নতুন ইনফরমেশন তৈরি করা হয়।

ডাটা স্টোরেজ (Storage)

এই পদ্ধতিতে ডাটা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে পরবর্তীকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার সিস্টেমে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে স্টোর করা হয়।

আউটপুট (Output)

আউটপুট বলতে ডাটা প্রসেসিংয়ের পর প্রাপ্ত ফলাফলকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ডাটা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ফলাফল বা output-কে মনিটরের মাধ্যমে বর্হিজগতের কাছে প্রদর্শন (display) করা যেতে পারে অথবা প্রাপ্ত ফলাফলের প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে।

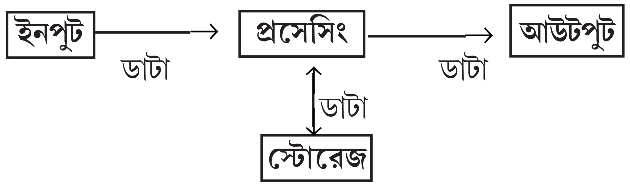

চিত্র ১.৮: কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যাবলী

চিত্র নং ১.৮-এ কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যাবলী দেখানো হয়েছে। আরও বিস্তৃতভাবে কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হল। মনে করা যাক, দশটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোটো সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করতে

হবে। এই কার্যটি সম্পাদন করার জন্য প্রথমে দশটি সংখ্যাকে ইনপুট হিসাবে কম্পিউটার সিস্টেমকে দিতে হবে। এই ইনপুটগুলি থেকে ডাটা প্রসেসিং-এর মাধ্যমে কম্পিউটার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোটো সংখ্যাটি আউটপুট হিসাবে চিহ্নিত করবে। এই আউটপুটগুলি পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে কম্পিউটারে স্টোর করা যেতে পারে অথবা মনিটারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলিকে (output) বর্হিজগতের কাছে দেখানো যেতে পারে।

১.৪ কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Computer)

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের বিভিন্ন রকম শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে কম্পিউটার সিস্টেমগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer), ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) এবং হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(i) অ্যানালগ কম্পিউটার— এই ধরনের কম্পিউটার গণনার পরিবর্তে পরিমাপ দ্বারা কার্য সম্পন্ন করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—গাড়ির স্পিডোমিটার।

(ii) ডিজিটাল কম্পিউটার— এই ধরনের কম্পিউটার সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। এককথায়, এই ধরনের কম্পিউটারগুলি এক একটি গণকযন্ত্র এবং সাধারণভাবে এই প্রকার কম্পিউটারের ব্যবহারই বেশি।

(iii) হাইব্রিড কম্পিউটার— যে সকল কম্পিউটারে অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় প্রকার কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় সেগুলিকে হাইব্রিড কম্পিউটার বলা হয়।

বর্তমানে যে ধরনের কম্পিউটার বেশি ব্যবহৃত হয় তা হল ডিজিটাল মাইক্রো কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার। নীচে ছকের সাহায্যে কম্পিউটারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা হয়েছে।

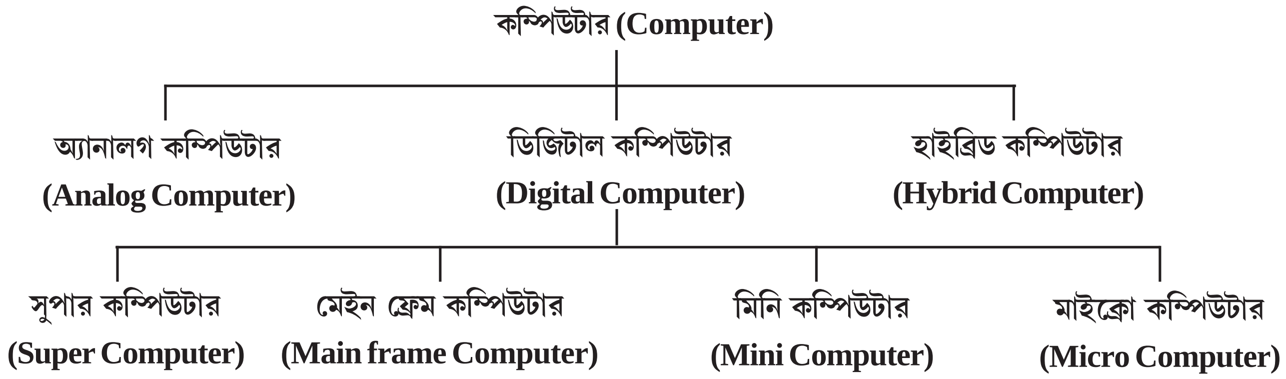

আকার, আয়তন ও আকৃতি এবং কার্য ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটার সিস্টেমগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

সুপার কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার এবং পার্সোনাল কম্পিউটার বা PC বা মাইক্রো কম্পিউটার। নীচে এগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

মাইক্রো কম্পিউটার— মাইক্রো কম্পিউটার হল মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তৈরি সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত কম্পিউটার। প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে মাইক্রো কম্পিউটারের আকৃতিতে নানা পরিবর্তন হয়েছে। মাইক্রো কম্পিউটারকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, নোটবুক কম্পিউটার ইত্যাদি। মাইক্রো কম্পিউটার আকারে সবথেকে ছোটো হয়।

মিনি কম্পিউটার— এই ধরনের কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়, দামী এবং কার্যকারিতার দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। মিনি কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছিল একইসঙ্গে একাধিক ব্যবহারকারীকে পরিসেবা দেওয়ার জন্য এবং তাদের কার্য সম্পন্ন করার জন্য।

মেইন ফ্রেম কম্পিউটার— এই ধরনের কম্পিউটারের স্টোরেজ ক্ষমতা ও প্রসেসিং-এর গতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই কম্পিউটারে বেশি সংখ্যায় টার্মিনাল যুক্ত থাকার কারণে একসঙ্গে অনেক মানুষ ব্যবহার করতে পারে। ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং রেলওয়ে যেখানে একসঙ্গে অনেকজনকে পরিসেবা দেওয়ার দরকার হয় সেই সব ক্ষেত্রে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

সুপার কম্পিউটার— এই ধরনের কম্পিউটারগুলি হল সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে অনেক জটিল এবং বৃহৎ কার্যসমূহ সম্পাদন করতে পারে। সাধারণত এই ধরনের কম্পিউটার জটিল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্য সম্পাদনে এবং গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১.৫. কম্পিউটারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী (Various Features of the Computer System)

কম্পিউটার হল একটি বৈদ্যুতিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

গতি (Speed) : কম্পিউটার নির্দেশ অনুযায়ী কোনো জটিল কাজ অতি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে পারে। কম্পিউটারের কাজ করার গতিকে মিলি (Mili) সেকেন্ড (10^{-3}সেকেন্ড), মাইক্রো (Micro) সেকেন্ড (10^{-6}সেকেন্ড), ন্যানো (Nano) সেকেন্ড (10^{-9}সেকেন্ড), পিকো (Pico) সেকেন্ড (10^{-12}সেকেন্ড), ফেমটো (Famto) সেকেন্ড (10^{-13}সেকেন্ড) এবং এ্যাটো (Atto) সেকেন্ড (10^{-18}সেকেন্ড) প্রভৃতি এককে প্রকাশ করা হয়।

সূক্ষ্মতা (Accuarcy): নির্ভুল গণনার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের কোনো বিকল্প নেই। কোনো গণনার শুরু থেকে শেষ অবধি কম্পিউটার সমানগতিতে ও সমান সূক্ষ্মতায় কাজ করতে সক্ষম। তবে কম্পিউটার সম্পূর্ণ সঠিক ফলাফল তখনই দেয় যদি না ব্যবহারকারীর কোনো ভুল থাকে।

সঞ্চয় বা সংরক্ষণ ক্ষমতা (Storage Capacity): প্রচুর পরিমাণ তথ্য কম্পিউটার তার মেমোরি বা স্টোরেজ অংশে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন মতো তথ্য পরবর্তী কার্যে ব্যবহার করা যায়। নির্দেশ অনুযায়ী সংরক্ষিত তথ্য কম্পিউটার সিস্টেম থেকে মুছেও ফেলা যায়।

অধ্যবসায় (Diligence): কম্পিউটার একই কাজ বারবার অতি অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে করতে পারে।

স্বয়ংক্রিয়তা (Automation): প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটারে কোনো নির্দেশ দিলে কম্পিউটার কোনো সহযোগিতা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই নির্দেশ পালন করতে সক্ষম।

বহুমুখিতা (Versatility): কম্পিউটার একই সাথে বিভিন্ন রকমের কাজ সম্পাদন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটারের মাধ্যমে একই সময়ে গান শোনা, কোনো ফাইল কপি করা এবং চিঠি লেখা যেতে পারে।

১.৬. কম্পিউটার সিস্টেমের গঠন (Structure of a Computer System)

একটি কম্পিউটার সিস্টেম বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে তৈরি হয় এবং এই যন্ত্রাংশগুলিকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলা হয়। একটি কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলি একে অন্যের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে। সাধারণভাবে একটি কম্পিউটার সিস্টেম চারটি ইউনিট বা সাব-সিস্টেমের (Component or Unit) সমন্বয়ে তৈরি হয়।

যেমন— ইনপুট ইউনিট (Input unit), আউটপুট ইউনিট (Output unit), সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (Central Processing unit) এবং মেমোরি ইউনিট (Memory unit)। এই ইউনিটগুলি সম্বন্ধে নীচে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৬.১. ইনপুট ইউনিট (Input Unit)

কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কার্য সম্পন্ন করতে হলে যে ইউনিটের মাধ্যমে কম্পিউটারকে ডাটা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দেওয়া হয় সেটিকে ইনপুট ইউনিট বলে। ইনপুট ইউনিটের (Input unit) প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করার জন্য যে যন্ত্রাংশটি ব্যবহৃত হয় সেটিকে ইনপুট ডিভাইস (Input device) বলা হয়। নিম্নে কিছু ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কি-বোর্ড (Key board)

এটি একটি ইনপুট ডিভাইস এবং এর সাহায্যে সরাসরি কম্পিউটারের মধ্যে ইনপুট দেওয়া হয় কোনো কার্য সম্পাদন করার জন্য। সাধারণ টাইপ রাইটারের সাথে কি-বোর্ডের অনেকাংশে মিল দেখা যায়। কি-বোর্ডে মূলত তিন ধরনের Keys থাকে।

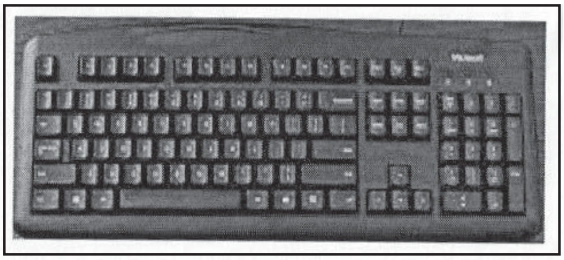

চিত্র ১.৯: কী-বোর্ড

1. নিউমেরিক কি-প্যাড: এটি 0,1,2,........,9,+,-,×,/ ইত্যাদি কি (Keys) নিয়ে গঠিত।
2. আলফা নিউমেরিক কি-প্যাড: এটি A,B,C,......,Z ইত্যাদি কি (Keys) নিয়ে গঠিত।
3. ফাংশনাল কি প্যাড: কি বোর্ডের একেবারে ওপরের দিকে F_1 থেকে F_{12} পর্যন্ত এই 12 টি কি-কে একত্রে ফাংশনাল কি-প্যাড বলা হয়।

মাউস (Mouse)

মাউসও একটি ইনপুট ডিভাইস। এটি সাধারণত মনিটরের স্ক্রিনে কারসর (Cursor) এর পজিশন ঠিক করতে ব্যবহার করা হয়। মাউসের সাধারণত দুটি বোতাম (Button) থাকে, একটি রাইট বোতাম এবং অন্যটি লেফ্ট বোতাম নামে পরিচিত।

চিত্র ১.১০: মাউস

স্ক্যানার (Scanner)

স্ক্যানার একটি অতি প্রয়োজনীয় ইনপুট ডিভাইস। এর সাহায্যে কোনো ডকুমেন্ট বা ছবি স্ক্যান করা যায় এবং পরবর্তীকালে ঐ স্ক্যান করা ছবি প্রয়োজনে এডিট (Edit)ও করা যায়। বিভিন্ন ধরনের স্ক্যানার দেখা যায়। যেমন—Flat Bed Scanner, Drum Scanner ইত্যাদি।

চিত্র ১.১১: স্ক্যানার

১.৬.২ আউটপুট ইউনিট (Output Unit)

কম্পিউটারকে ইনপুট দেওয়া কোনো তথ্য বা ডাটা প্রসেসিং হওয়ার পর যুক্তিযুক্ত ফলাফল যে ইউনিটের মাধ্যমে আমাদের কাছে ডিসপ্লে (display) করা হয়, সেই ইউনিটটি আউটপুট ইউনিট (Output unit) হিসাবে পরিচিত। যে যন্ত্রাংশের মাধ্যমে আউটপুট ইউনিটের কার্য সম্পাদিত হয় সেটিকে আউটপুট ডিভাইস (Output device) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, স্পিকার ইত্যাদি আউটপুট ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মনিটর (VDU)

Visual Display Unit বা মনিটর হল একটি আউটপুট ডিভাইস। CRT (Cathode Ray Tube), LCD (Liquid Crystal Display) এবং LED (Light Emitting Diode) এই তিন ধরনের মনিটর সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

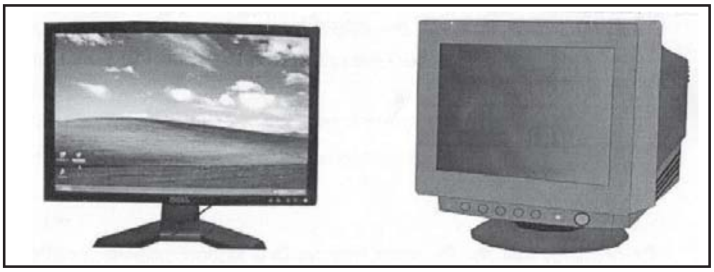

চিত্র ১.১২: মনিটর

প্রিন্টার (Printer)

এই আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো তথ্য কাগজে ছাপা আকারে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার পাওয়া যায়। যেমন- Laser-Jet Printer, Ink-Jet Printer, Dot-Matrix Printer ইত্যাদি।

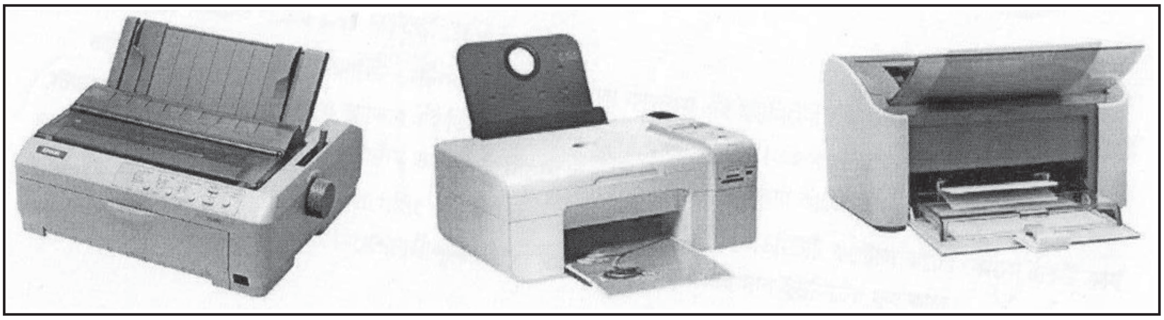

চিত্র ১.১২ ক: ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার খ: ইন্‌কজেট প্রিন্টার গ: লেজার প্রিন্টার

১.৬.৩ সেন্ট্রাল প্রোসেসিং ইউনিট (Central Processing Unit)

সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হল কম্পিউটার সিস্টেমের একটি মূল অংশ। আসলে এটি হল একটি ইন্টিগ্রেটেড সারকিট (IC) বা চিপ। এটি সাধারণত দুটি সাব ইউনিট (Sub unit) নিয়ে গঠিত, যেমন — অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit) এবং কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit)।

এই দুটি সাব ইউনিট সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit)

কম্পিউটারের সকল প্রকার গাণিতিক এবং লজিক্যাল কাজকর্ম এই ইউনিটের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সাব ইউনিটটি স্টোরেজ রেজিস্টার, অ্যাকুমুলেটর ও অ্যাডার এই তিন প্রকার রেজিস্ট্যারের সমন্বয়ে গঠিত। রেজিস্টার হল CPU এর মধ্যে অবস্থিত ছোটো ছোটো মেমোরি ইউনিট যা-CPU তে প্রসেসিং চলাকালীন মধ্যবর্তী ডাটা স্টোর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সাব ইউনিটের স্টোরেজ রেজিস্টারগুলি কোনো কার্য সম্পন্ন করার সময় প্রয়োজনীয় ডাটা এবং নির্দেশ অস্থায়ীভাবে স্টোর করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit)

CPU-এর মধ্যে প্রসেসিং চলাকালীন সকল অপারেশনকে এই ইউনিটটি কন্ট্রোল করে। কোনো একটি কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য -প্রয়োজনীয় ডাটা এবং নির্দেশাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই এই সাব ইউনিটের মূল কাজ।

১.৬.৪ মেমোরি (Memory)

এই ইউনিটের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রসেসিং-এর পূর্বে এবং পরে, স্থায়ী ও অস্থায়ী দু'ভাবেই স্টোর করা হয়। ধারণ ক্ষমতা (Storage Capacity), গতি (Speed), দাম (Cost) এবং লোকেশন (Location) অনুসারে কম্পিউটার মেমোরিকে প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল, প্রাইমারী মেমোরি (Primary Memory) এবং সেকেন্ডারী মেমোরি (Secondary Memory)।

প্রাইমারী মেমোরি (Primary Memory)

যে মেমোরির সাহায্য ছাড়া কোনো একটি কম্পিউটার কোনো মতেই সচল করা সম্ভব নয়, সেই মেমোরিকে প্রাইমারী মেমোরি বলা হয়। প্রাইমারী মেমোরি সাধারণত দুই ধরনের হয়, যেমন — RAM (Random Aecess Memory) ও ROM (Read Only Memory)। RAM-এ সঞ্চিত তথ্য ক্ষণস্থায়ী এবং যথেচ্ছভাবে লেখা ও সঞ্চিত তথ্য পড়া যায়। আর ROM-এ সঞ্চিত তথ্য চিরস্থায়ী এবং কোনো নতুন তথ্য লেখা যায় না, শুধুমাত্র সঞ্চিত তথ্য পড়া যায়।

সেকেন্ডারী মেমোরি (Secondary Memory)

প্রাইমারী মেমোরি ছাড়া কম্পিউটারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সঞ্চয়ের জন্য অন্য যে সকল অপেক্ষাকৃত কম-দামী মেমোরি ব্যবহার করা হয়, তাকে সেকেন্ডারী মেমোরি (Secondary Memory) বলা হয়। এই সকল মেমোরির তথ্য দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ কম্পিউটার বন্ধ করে দিলেও এই সকল তথ্য মেমোরির মধ্যে সঞ্চিত থাকে। যেহেতু সেকেন্ডারী মেমোরি প্রাইমারী মেমোরির তুলনায় CPU থেকে দূরে অবস্থান করে, সেকেন্ডারী মেমোরি থেকে ডাটা অ্যাক্সেসিং (accessing) প্রাইমারী মেমোরির তুলনায় অনেক ধীর গতিতে হয়। ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk), হার্ডডিস্ক (Hard Disk), সিডি রম (CD ROM), ইত্যাদি হল সেকেন্ডারী মেমোরি। নিম্নে এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)

এটি প্লাস্টিকের তৈরি চৌকো চাকতির ন্যায় যার উভয় পাশে ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ দেওয়া থাকে। সাধারণত 3.5 ইঞ্চি ও 2.5 ইঞ্চির ফ্লপি ডিস্ক বাজারে বেশি দেখা যায়। চুম্বকীকরণ প্রক্রিয়ায় এর মধ্যে তথ্য স্টোর করা হয়।

হার্ড ডিস্ক (Hard Disk)

অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ তথ্য স্টোর করার জন্য বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এক ধরনের ম্যাগনেটিক ডিস্ক ব্যবহার করা হয়, যেটি হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত। অনেকগুলি ফ্লপি ডিস্ক পরপর সাজিয়ে রাখলে যে রকম দেখতে হয়, হার্ড ডিস্কের অভ্যন্তরীণ গঠন অনেকটা সেরকম। এই ডিস্কের একটি রিড ও একটি রাইট হেড থাকে। পুরো ব্যবস্থাটি একটি শক্ত বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে হার্ড ডিক্সটির সুরক্ষার জন্য। বর্তমানে বাজারে 500GB-1000GB হার্ড-ডিস্ক বেশি পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত ইউনিটগুলি ছাড়াও কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে মাদারবোর্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বোর্ডের মধ্যে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস প্রসেসর, RAM, গ্রাফিক্সকার্ড, সাউন্ডকার্ড লাগানো থাকে। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর মাদার বোর্ড পাওয়া যায়। তবে Intel-এর মাদার বোর্ডই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

১.৭ সফটওয়্যার (Software)

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার অংশ নিজে নিজে কম্পিউটারকে সচল করতে পারে না। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যেসব প্রোগ্রামের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটি কম্পিউটারকে চালু করতে বা বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্যে করে সেই সব প্রোগামকে বলা হয় ***সফ্টওয়্যার***। কাজের ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে সফটওয়্যারকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও সিস্টেম সফটওয়্যার।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ার (Application Software)

যে সকল সফটওয়্যার কোনো নির্দিষ্টি বিষয় সংক্রান্ত সমগোত্রীয় বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে। যেমন Ms-Word, ওয়ার্ড প্রসেসিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলির মধ্যে আবার কিছু কিছু সফটওয়্যার দেখা যায় যারা কেবলমাত্র এককভাবে একটিই কাজ করতে সক্ষম। সেই সকল সফটওয়্যারগুলিকে কখনো কখনো ইউটিলিটি সফটওয়্যার বলা হয়। যেমন — পার্টিশন ম্যাজিক একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা কেবলমাত্র ডিস্ক পার্টিশন করতেই ব্যবহৃত হয়।

সিস্টেম সফটওয়ার (System Software)

যে সকল সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে সেগুলিকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলা হয়। যেমন — Windows, Linux ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেম (OS) হল সিস্টেম সফটওয়্যার।

সারসংক্ষেপ

- Abacus—কে কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ বলা হয়।
- অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন আবিষ্কারকারী চালর্স ব্যাবেজকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।
- বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত কম্পিউটারকে মোট পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়।
- কাজের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে অ্যানালগ, ডিজিটাল এবং হাইব্রিড এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমানে যে ধরনের কম্পিউটার সর্বাধিক প্রচলিত তা হল ডিজিটাল মাইক্রো-কম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার (PC)।
- কম্পিউটারের বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইসের (মাউস, কী-বোর্ড, স্ক্যানার ইত্যাদি) মাধ্যমে কম্পিউটারে তথ্য সরবরাহ করা হয়। এই তথ্যগুলিকে অন্যান্য ডাটা বা তথ্যের সাহায্যে প্রসেসিং (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট) করে যুক্তিপূর্ণ ফলাফল আউটপুট ডিভাইসের(মনিটর,প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি) মাধ্যমে প্রদর্শিত বা মুদ্রিত হয়।
- কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রাইমারী মেমোরি (RAM, ROM) এবং সেকেন্ডারী মেমোরি (Hard Disk, Pen Drive) ব্যবহার করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

কম্পিউটার, Difference Engine, ENIAC, IBM, IC, LSIC, VLSI, LCD, LED, ইনপুট, আউটপুট, প্রসেস, স্টোরেজ, ডাটা, ইনফরমেশন, CPU, মেমোরি, HDD, CRT, Software, Hardware।

অনুশীলনী (Exercises)

(১) কম্পিউটার কাকে বলে?

(২) কম্পিউটারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগগুলি উল্লেখ করো।

(৩) কম্পিউটারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

(৪) কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্মগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

(৫) কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলির কাজ বর্ণনা কর।

(৬) টীকা লেখো :

(ক) পার্সোনাল কম্পিউটার (PC), (খ) কি-বোর্ড (গ) মাউস (ঘ) CPU

(৭) উদাহরণ দাও :

(ক) দুটি ইনপুট ও দুটি আউটপুট ডিভাইস। (খ) দুটি ডিভাইস যেগুলি ইনপুট ও আউটপুট উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। (গ) দুটি স্টোরেজ ডিভাইস।

(৮) সম্পূর্ণ নাম লেখো: RAM, ROM, LED, LCD, CRT, VLSI, IC, HDD.

(৯) কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্ম সম্পর্কে আলোকপাত করো।

(১০) অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের পার্থক্য লেখো।

(১১) কম্পিউটারের ইনপুট, প্রোসেসিং এবং আউটপুট সম্পর্কে কী বোঝো তা লেখো।

(১২) পিকো সেকেন্ড কাকে বলে?

(১৩) কম্পিউটারের 'বহুমুখিতা' একটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো।

(১৪) হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের পার্থক্য লেখো।

(১৫) কম্পিউটারের ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস বলতে কী বোঝায়?

(১৬) বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টারের নাম লেখো।

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক

ক. নিম্নের হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশগুলির নাম লেখো।

(১)

(২)

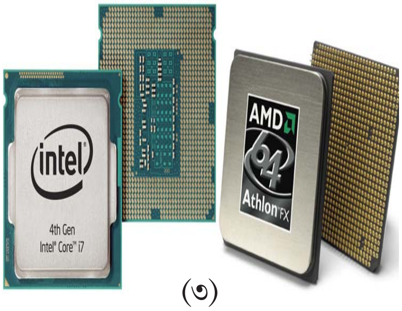

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

খ. Ms-Paint ব্যবহার করে Mouse—এর সাহায্যে নীচের ছবিটি অঙ্কন করে রং করো।

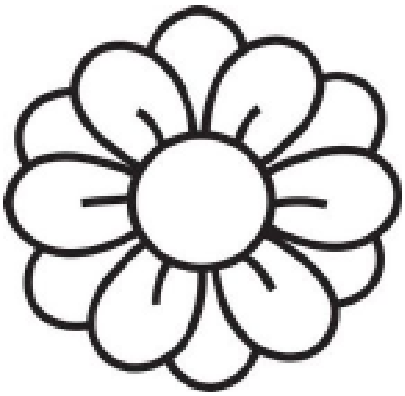

অধ্যায়

২

কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম

২.১. সূচনা (Introduction)

এই অধ্যায়ে কম্পিউটারের মেমোরি, অপারেটিং সিস্টেম এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মেমোরি কম্পিউটার সিস্টেমের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ যেখানে বিভিন্ন তথ্য এবং কম্পিউটারকে প্রদত্ত বিবিধ নির্দেশ সঞ্চিত হয়। এই তথ্যসমূহ এবং নির্দেশাবলী বিভিন্ন ইনপুট যন্ত্রাংশের মাধ্যমে প্রদত্ত হতে পারে, আবার কম্পিউটারে প্রসেসিং চলাকালীন মধ্যবর্ত্তী পর্যায়ের আংশিক ফলাফলও হতে পারে। কোনো কার্য সম্পাদন করার সময় কম্পিউটার এই মেমোরি অংশ থেকে তথ্য ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ তুলে নিয়ে কাজ করে। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসমূহ বা হার্ডওয়ার অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে ও কোনো বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামকে (সফ্টওয়ারকে) চালানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এককথায়, অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়ার ও অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়ারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং সমগ্র কম্পিউটার সিস্টেম যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হল অনেকগুলি কম্পিউটারের মধ্যে একটি সংযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলি পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য (যেমন লিখিত টেক্সট, শব্দ, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি) আদান প্রদান করতে পারে।

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে সেগুলি হল:

- কম্পিউটারের মেমোরি সম্পর্কে ধারণা এবং মেমোরির বিস্তৃত শ্রেণী-বিভাগ (প্রাইমারী মেমোরি, সেকেন্ডারী মেমোরী এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ)।
- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির বৈশিষ্ট্য ও তুলনা এবং RAM ও ROM এর বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস।
- সফ্টওয়ারের ধারণা ও শ্রেণী-বিভাগ (সিস্টেম সফ্টওয়ার, অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়ার ও ইউটিলিটি সফ্টওয়ার)।
- অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও তার শ্রেণী-বিভাগ এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ক টেকনোলজি ও তাদের সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদি।

২.২ কম্পিউটার মেমোরি (Computer Memory)

কম্পিউটার মেমোরিতে তথ্য ও নির্দেশাবলী বাইনারি কোড আকারে সঞ্চিত হয়। বাইনারি (binary) কোড হল 0 এবং 1 এর সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের কোড যার উপর ভিত্তি করে আধুনিক ডিজিট্যাল কম্পিউটার সিস্টেমের উদ্ভাবন হয়েছে। মেমোরির মধ্যে ছোট ছোট ঘর বা স্থান থাকে যেখানে তথ্য ও নির্দেশ সঞ্চিত হয়। এগুলিকে সেল (Cell) বলা হয়। মেমোরিতে আগে থেকে সঞ্চিত তথ্য বা ডাটা ফিরে পেতে হলে যে সেলে তথ্য সঞ্চিত আছে তার অবস্থানের ঠিকানা বলে দিতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ডাটার ঠিকানা user বা ব্যবহারকারীর জানার প্রয়োজন হয় না কেননা কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কাজটি করে। যে কোনো ঠিকানায় সঞ্চিত তথ্য বা ডাটা যতবার খুশি ব্যবহার করা যায় কিন্তু নতুন কোন তথ্য ওই ঠিকানায় স্টোর করলে পূর্বের সঞ্চিত তথ্য মুছে যায়। আবার ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুসারে কোন ঠিকানা থেকে তথ্য মুছে ফেলতে পারে।

একটি কম্পিউটার সিস্টেমে একাধিক ভিন্ন ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হতে পারে। মেমোরির আকার, কম্পিটারের মধ্যে মেমোরির অবস্থান, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, কম্পিউটার মেমোরির বিভিন্ন প্রকারভেদ করা হয়। কম্পিউটার মেমোরিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- প্রাইমারি বা মেইন মেমোরি (Primary / Main Memory) এবং
- সেকেন্ডারি বা অক্সিলিয়ারি মেমোরি (Secondary / Auxiliary Memory)

নিম্নে এগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২.১ প্রাইমারি মেমোরি (Primary Memory)

প্রাইমারি মেমোরি বা প্রধান মেমোরিকেই কম্পিউটার সিস্টেমের 'প্রকৃত ব্রেন' বলা যায়। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে প্রাইমারি মেমোরির অবস্থান CPU-র পরেই হয় এবং নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা ও নির্দেশাবলী এখানেই সঞ্চিত হয়। কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে কোনো একটি প্রোগ্রাম যখন এগজিকিউটেড (executed) হয়, সেটিকে অবশ্যই সেই মুহূর্তে প্রাইমারী মেমোরির মধ্যে স্টোর থাকতে হবে। কারণ CPU কেবলমাত্র প্রাইমারি মেমোরিতে অবস্থিত প্রোগ্রাম ও তথ্য সরাসরি অ্যাক্সেস (access) করতে পারে। সুতরাং এই মেমোরির সাহায্য ছাড়া একটি কম্পিউটার কোনো ভাবেই কোনো কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। প্রাইমারি মেমোরির বিভিন্ন অংশ আবার বিবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

প্রাইমারি মেমোরি যে চারটি অংশে বিভক্ত তা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ইনপুট স্টোরেজ এরিয়া (ডাটা ও নির্দেশাবলী প্রসেসিং-এর আগে পর্যন্ত এখানে স্টোর হয়)	**প্রোগামস্টোরেজ এরিয়া** (প্রোগ্রাম বা নির্দেশসমূহ এখানে স্টোর হয়) **ওয়াকিংস্টোরেজ এরিয়া** (প্রসেসিং চলছে এমন ডাটা বা প্রোগ্রাম ও মধ্যবর্তী ফলাফল এখানে সঞ্চিত হয়)	**আউটপুট স্টোরেজ এরিয়া** (প্রসেসিং-এর পর প্রাপ্ত ফলাফল এই অংশে আউটপুট আকারে পেশ করার জন্য সঞ্চিত হয়)

প্রাইমারি মেমোরির সঞ্চয় ক্ষমতা (Storage Capacity) নির্ভর করে এই অংশে কতগুলি ঠিকানা (address) আছে এবং প্রতিটি ঠিকানায় কত বিট বা তথ্য স্টোর হতে পারে তার উপর। প্রাইমারি মেমোরিতে আবার দু ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয়। এগুলি হল—

- র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি (Random Access Memory or RAM) এবং
- রিড অনলি মেমোরি (Read Only Memory or ROM)

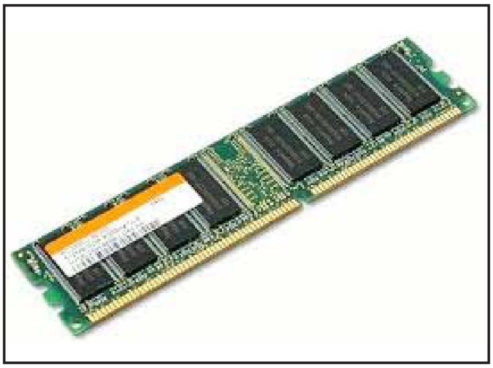

চিত্র ২.১ : র‍্যাম

২.২.১.১ র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি (Random Access Memory)

র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি হল এমন একধরনের মেমোরি যার মধ্যে যে কোনো অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পড়া যায় এবং যে কোনো অবস্থানে প্রয়োজনমতো তথ্য লেখা (write) যায়। র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি বা RAM হল প্রাইমারি মেমোরির সেই অংশ যেখানে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ডাটা স্টোর হয় প্রসেসিং এর জন্য। ইনপুট ডিভাইস থেকে আসা সমস্ত তথ্য RAM এ জমা হয় প্রসেসিং এর জন্য। পরবর্তীকালে CPU, RAM থেকে তথ্য বা নির্দেশ নিয়ে প্রসেস করে প্রয়োজনীয় ফলাফল তৈরি করে এবং সংরক্ষণের জন্য আবার RAM এ ফেরত পাঠায়। ঠিকানা ব্যবহার করে RAM এর যে কোনো অবস্থান থেকে সঞ্চিত তথ্য পড়া যায় (Read) এবং যে কোনো অবস্থানে নতুন তথ্য লেখা যায়

(Write)। এই পড়া এবং লেখা বা Access করা কোনো নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে নয়, বরং এলোমেলো ভাবে (Randomly) করা সম্ভব। সেই জন্য এই *মেমোরিকে র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি* বলা হয়। RAM কে *রিড রাইট মেমোরি* (Read/ Write memory) ও বলা হয় কারণ এখানে পড়া ও লেখা উভয় কাজই করা সম্ভব হয়। RAM এ বৈদুতিক চার্জের ভিত্তিতে তথ্য স্টোর হয়, তাই কম্পিউটারের সুইচ অফ করলে বা কোন কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে RAM এ সঞ্চিত যাবতীয় তথ্য মুছে যায়। যতক্ষণ কম্পিউটার চালু থাকে ততক্ষণই RAM কার্যকর থাকে। সেই কারণে RAM কে *অস্থায়ী (Volatile)* মেমোরিও বলা হয়।

কম্পিউটার বুটিং (booting) এর সময় সেকেন্ডারি মেমোরি বা স্টোরেজ থেকে অপারেটিং সিস্টেম প্রাইমারি মেমোরিতে অবস্থিত RAM এ কপি হয় এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য উপযোগী করে তোলে। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে RAM মাদার বোর্ডের মধ্যে ব্যাংক আকারে বসানো থাকে। বর্তমানে, 512 MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB প্রভৃতি বিভিন্ন Storage Capacity-র RAM পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত RAM লাগিয়েও কম্পিউটারের অস্থায়ী মেমোরি বাড়ানো যায়। উন্নত অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত RAM এর প্রয়োজন হয়। RAM যত বেশি হবে কম্পিউটারের কাজের গতি ও দক্ষতা তত বেশি হবে।

সাধারণত দুই প্রকারের RAM পাওয়া যায়। যেমন—

- স্টাটিক র‍্যাম বা SRAM (Static RAM) এবং
- ডাইনামিক র‍্যাম বা DRAM(Dynamic RAM)

স্টাটিক র‍্যাম (Static RAM or SRAM)

SRAM প্রধানত বাইপোল সেমিকন্ডাকটর প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং এই মেমোরির প্রত্যেকটি সেল 6 টি ট্র্যানজিস্টরের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই RAM খুব দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং দামি। যেহেতু SRAM এর গঠন জটিল এবং তথ্য ধারণক্ষমতা কম, তাই অধিকাংশ কম্পিউটারে সীমিত পরিমাণে SRAM থাকে। সাধারণত ক্যাশ মেমোরিতে (Cache memory) SRAM ব্যবহৃত হয়। SRAM এ তথ্য স্টোর হয় ‘‘স্ট্যাটিক” পদ্ধতিতে, অর্থাৎ বিদুৎ সরবরাহ চালু থাকা পর্যন্ত তথ্য সঞ্চিত (Store) থাকে, এইজন্য SRAM কে রিফ্রেশ (refresh) করার প্রয়োজন পড়ে না।

ডাইনামিক র‍্যাম (Dynamic RAM or DRAM)

সাধারণত DRAM ক্যাপাসিটরের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এই প্রকার মেমোরিতে তথ্য স্টোর করা হয় ‘‘ডাইনামিক” পদ্ধতিতে এবং সঞ্চিত তথ্য বা ডাটা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিদিষ্ট ব্যবধানে পুনরায় রিচার্জ করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও SRAM এর মত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে সঞ্চিত যাবতীয় তথ্য মুছে যায়। স্বাভাবিকভাবেই DRAM, SRAM এর থেকে ধীরগতি সম্পন্ন এবং DRAM এর দামও তুলনামূলকভাবে কম। কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরির অধিকাংশই DRAM দ্বারা গঠিত। নিম্নে SRAM ও DRAM র পার্থক্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

SRAM ও DRAM এর পার্থক্য:

SRAM	DRAM
1. ট্রানজিস্টর প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্মিত হয়।	1. ক্যাপাসিটর প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্মিত হয়।
2. তথ্য ধারণক্ষমতা (Storage Capacity) তুলনামূলকভাবে কম।	2. তথ্য ধারণক্ষমতা (Storage Capacity) তুলনামূলকভাবে বেশী।

SRAM	DRAM
3. দ্রুতগতি সম্পন্ন। 4. রিফ্রেশ করার প্রয়োজন হয় না। 5. অপেক্ষাকৃত বেশি দামি। 6. প্রধানত ক্যাশ মেমোরিতে ব্যবহৃত হয়।	3. গতি তুলনামূলকভাবে কম। 4. নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রিফ্রেশ করতে হয়। 5. দাম তুলনামূলকভাবে কম। 6. প্রাইমারি মেমোরির অধিকাংশই গঠিত হয় DRAM দিয়ে।

২.২.১.২ রিড অনলি মেমোরি (Read Only Memory)

রিড অনলি মেমোরি বা ROM হল এক ধরনের স্থায়ী মেমোরি যেখানে আগে থেকে সঞ্চিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র পড়া (Read) যায় কিন্তু নতুন কোনো তথ্য সাধারণভাবে লেখা যায় না। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে সাধারণত প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে ROM থাকে যেখানে কম্পিউটারের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং কোড সঞ্চিত থাকে। সার্কিট প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি এই মেমোরি বৈদ্যুতিক চার্জের পরিবর্তে লজিক গেটের ওপর নির্ভরশীল। এই কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও বা কম্পিউটার বন্ধ করা হলেও ROM-এ সঞ্চিত তথ্য মুছে যায় না। অর্থাৎ ROM-এ সঞ্চিত তথ্যাদি স্থায়ী এবং এই কারণে ROM কে *স্থায়ী (non-volatile)* মেমোরি বলা হয়। যে তথ্যাদি ROM এ সঞ্চিত থাকে তা ROM প্রস্তুতকারক সংস্থাই আগে থেকে এর মধ্যে স্টোর করে দেন এবং ব্যবহারকারী এর কোন পরিবর্তন করতে পারে না। এই নির্দেশাবলী বা প্রোগ্রাম *ফার্মওয়্যার (Firmware)* নামে পরিচিত। ROM এ সঞ্চিত সিস্টেম প্রোগ্রামসমূহ, হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রক প্রোগ্রামসমূহ ফার্মওয়ারের উদাহরণ।

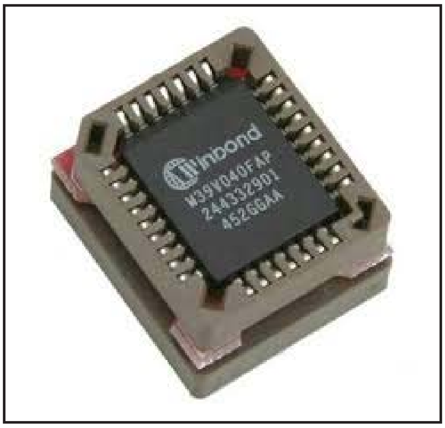

চিত্র ২.২: রম্

কম্পিউটারে বিদুৎ সরবরাহ চালু করার পর এবং ব্যবহারকারী (User) কাজ শুরু করার আগে কম্পিউটার পূর্বনির্ধারিত যে কাজগুলি সম্পাদন করে তার নির্দেশসমূহ ROM এ সঞ্চিত থাকে। ROM এর দ্বারা পরিচালিত এই কাজগুলি হল:

1. *RAM টেস্ট (RAM Test):* এই প্রক্রিয়ায় মূলত RAM সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।
2. *Power on Self Test (Post):* এই পদ্ধতিতে ইনপুট যন্ত্রসমূহ (কী-বোর্ড, মাউস, ডিস্ক ড্রাইভ, স্ক্যানার ইত্যাদি) এবং আউটপুট যন্ত্র সমূহ (মনিটর, প্রিন্টার, স্পীকার ইত্যাদি) সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করা হয়।
3. ROM অ্যাক্টিভেটেড (activated) হয়েছে এবং কাজ শুরু করেছে তা সমস্ত পোর্ট (Port) গুলিকে জানানো হয়।
4. *বুটিং (Booting):* কম্পিউটারকে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণের উপযোগী করে তোলার জন্য অপারেটিং সিস্টেমকে সেকেন্ডারি স্টোরেজ (হার্ডডিস্ক, DVD,CD ইত্যাদি) থেকে RAM এ লোড করা হয়। এই প্রক্রিয়াই বুটিং নামে পরিচিত।

ROM র প্রকারভেদ (Types of ROM)

ROM বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(a) প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি (Programmable Read Only Memory বা PROM)

এই ধরনের ROM এ কেবলমাত্র একবারই প্রোগ্রাম স্টোর করা যায়। PROM সুবিধাজনক ও নমনীয়, কিন্তু পুনরায় নতুন তথ্য স্টোর করার সুবিধা না থাকায় একবার নষ্ট হলে অব্যবহার্য হয়ে যায়।

(b) ইরেসেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি (Erasable Programmable Read Only Memory বা EPROM)

নাম থেকেই পরিষ্কার যে EPROM এ উপস্থিত তথ্যাদি বা প্রোগ্রাম মুছে ফেলে নতুন তথ্যাদি বা প্রোগ্রাম সঞ্চয় করা যায়। EPROM কে আবার নিম্নলিখিত দু ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(i) ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory বা EEPROM)— EEPROM এ EPROM এর সকল বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এই ধরনের ROM এ সঞ্চিত তথ্য মুছে ফেলার জন্য অতি বেগুনি আলোর পরিবর্তে ইলেকট্রিক পালস্ ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরির যে অংশে ব্যবহারকারীদের প্রোগ্রাম (user’s program) স্টোর হয়, সেখানে সাধারণত এই ধরনের ROM ব্যবহৃত হয়।

(ii) ইরেজেবল অল্টারেবল্ প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি (Erasable Alterable Programmable Read Only Memory বা EAPROM)—এই ধরনের EPROM এ তথ্য মোছা ও পরিবর্তন করা (alter) উভয়েরই সুবিধা আছে এবং তার জন্য বিশেষ কোনো প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার পড়ে না।

(c) আলট্রাভায়োলেট প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি (Ultraviolet Programmable Read Only Memory বা UVPROM)—

এই ধরনের ROM দীর্ঘস্থায়ী ও খুব দামি। সাধারণত যে সব ক্ষেত্রে তথ্য বা নির্দেশাবলী চিরস্থায়ী ভাবে স্টোর করার দরকার হয় সেইসব ক্ষেত্রে এই ধরনের ROM ব্যবহৃত হয়।

২.২.১.৩ RAM ও ROM এর তুলনা

RAM	ROM
1. RAM-এ সঞ্চিত তথ্য পড়া যায় এবং নতুন তথ্য লেখাও যায়।	1. ROM-এ সঞ্চিত তথ্যাদি শুধুমাত্র পড়া যায়, কিন্তু লেখা যায় না। যদিও EPROM এ তথ্য পুনরায় লেখা যায় এবং এর জন্য বিশেষ প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
2. RAM-এ তথ্য অস্থায়ীভাবে স্টোর হয়।	2. ROM-এ তথ্য স্থায়ীভাবে স্টোর হয়।
3. কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লোড করার জন্য RAM ব্যবহৃত হয়।	3. কম্পিউটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেসিং অর্থাৎ RAM Test, Post এবং বুটিং (Booting) ইত্যাদির জন্য ROM ব্যবহৃত হয়।
4. RAM-এ সঞ্চিত তথ্য বেশি দ্রুত গতিতে অ্যাকসেস (Access) করা যায়।	4. ROM-এ তথ্য অ্যাকসেস করার গতি তুলনামূলক ভাবে কম।
5. User লিখিত কোন তথ্য বা প্রোগ্রাম সাধারণত RAM-এ সঞ্চিত হয়।	5. প্রস্তুতকারক অপারেটিং সিস্টেম ROM-এ লোড করে রাখে।
6. User খুব সহজেই RAM-এ তথ্য লোড বা পরিবর্তন করতে পারে।	6. ROM-এ তথ্য পরিবর্তন করতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

২.২.২ সেকেন্ডারী বা অক্সিলিয়ারি মেমোরি (Secondary / Auxiliary Memory)

সেকেন্ডারি মেমোরি বা স্টোরেজ হল কম্পিউটারের একটি অতিরিক্ত স্টোরেজ যেখানে প্রচুর তথ্য এবং প্রোগ্রামসমূহ সংরক্ষিত রাখা যায়। এই মেমোরির নতুন তথ্য দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ কম্পিউটারে বিদুৎ সরবরাহ বন্ধ হলেও তথ্যসমূহ সেকেন্ডারি মেমোরিতে সঞ্চিত থাকে। এই মেমোরিতে তথ্যসমূহ লেখা ও সঞ্চিত তথ্যসমূহ পড়া খুব সহজেই করা যায়। তবে তথ্য লেখা বা পড়ার সময় বিদুৎ সরবরাহ না থাকলে তথ্য অ্যাকসেস করা যায় না। সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে কম্পিউটারের প্রাইমারী মেমোরি বা RAM-এ যে কোন তথ্য বা নির্দেশ আদান-প্রদান করা এবং RAM থেকে কোন তথ্য বা নির্দেশ এখানে সঞ্চয় করে রাখা যায়। এইজন্য সেকেন্ডারি মেমোরিকে *ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস* হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই মেমোরিকে কম্পিউটারের অংশ হতেই হবে এমন নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এই মেমোরি কম্পিউটারের বাইরে অবস্থান করতে পারে। এই কারণে সেকেন্ডারি মেমোরিকে *এক্সটারন্যাল (External) মেমোরি*ও বলা হয়। বর্তমানে CPU এর প্রয়োজন নয় এমন নির্দেশ সমূহ সেকেন্ডারি মেমোরিতে সঞ্চিত থাকে। প্রাইমারি মেমোরির সহায়ক হিসেবে সেকেন্ডারি মেমোরি ব্যবহৃত হয় বলে সেকেন্ডারি *মেমোরিকে সহায়ক* বা *Auxiliary Memory* ও বলা হয়। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে, সেকেন্ডারি মেমোরি সাধারণত প্রাইমারী মেমোরির পরে অবস্থান করে। ব্যবহারকারী এই মেমোরিতে যেমন পুরানো তথ্য মুছে ফেলতে পারেন তেমনই নতুন তথ্য লিখতেও পারেন। হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, সিডিরম, পেনড্রাইভ, ইত্যাদি হল সেকেন্ডারি মেমোরির উদাহরণ।

তথ্য অ্যাক্সেসিং এর (accessing) বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে সেকেন্ডারি মেমোরিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন সিকোয়েন্সিয়াল/সিরিয়াল অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইস (Sequential/Serial Access Storage Device বা SASD) এবং ডিরেক্ট/র‍্যান্ডম অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইস (Direct/ Random Access Storage Device বা DASD)। নীচে এগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

(a) সিকোয়েন্সিয়াল/সিরিয়াল অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইস (Sequential/Serial Access Storage Device বা SASD):

এই ধরনের স্টোরেজ ডিভাইসগুলিতে তথ্য নির্দিষ্ট ক্রম মেনে সজ্জিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তথ্য লেখা বা পড়া উভয়ই নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে হয়। এই ধরণের স্টোরেজ ডিভাইসগুলির যে কোনো অবস্থান থেকে যে কোনো তথ্য এলোমেলোভাবে অ্যাকসেস করা সম্ভব নয়, তাই নির্দিষ্ট তথ্য অ্যাকসেস করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে। পাঞ্চড কার্ড, ম্যাগনেটিক টেপ, ক্যাসেট টেপ ইত্যাদি হল এই ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস।

(b) ডিরেক্ট/র‍্যান্ডম অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইস (Direct/ Random Access Storage Device বা DASD):

এই ধরনের সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসগুলিতে কোন ক্রম ছাড়াই অর্থাৎ এলোমেলোভাবে যেখান থেকে খুশি তথ্য অ্যাকসেস করা যায়। এই কারণেই সিকোয়েন্সিয়াল/সিরিয়াল অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইসগুলির তুলনায় ডিরেক্ট অ্যাকসেস ডিভাইসগুলি থেকে তথ্য অ্যাকসেস করতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময় লাগে। যেমন— ফ্লপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক, সিডিরম, ডিভিডি ইত্যাদি হল এই ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস।

ডিরেক্ট অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইস আবার দুইপ্রকারের হয়। যেমন— ম্যাগনেটিক ডিস্ক এবং অপটিক্যাল ডিস্ক। নীচে এগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ম্যাগনেটিক ডিস্ক (Magnetic Disk)— ম্যাগনেটিক ডিস্ক গোলাকার হয় এবং এর উভয় পৃষ্ঠে সাধারণতঃ আয়রণ অক্সাইডের প্রলেপ দেওয়া থাকে। চুম্বকীকরণ প্রক্রিয়ায় এতে তথ্য স্টোর করা হয়। অনেক ধরণের ম্যাগনেটিক ডিস্ক আছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফ্লপি ডিস্ক ও হার্ড ডিস্ক।

ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)

বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে এলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্লপিডিস্ক ছিল সর্বাধিক ব্যবহৃত সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস। এই ধরনের ডিস্কের সঞ্চয় ক্ষমতা কম হলেও সহজে ব্যবহারযোগ্য, দামেও কম এবং বহনযোগ্য। ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করার জন্য CPU

ক্যাবিনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকে ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ যা ডিস্ককে ধরে রাখে এবং ডিস্ক থেকে তথ্য অ্যাকসেস করতে সাহায্য করে। ফ্লপি ডিস্ক নমনীয় প্লাস্টিকের তৈরি একটি গোলাকার চাকতি বা ডিস্ক যার উভয় তলেই ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপ থাকে, গোলাকার ডিস্কটি একটি বর্গাকার প্লাস্টিক জ্যাকেটের মধ্যে অবস্থান করে এবং ম্যাগনেটিক প্রক্রিয়ায় এই ডিস্কে তথ্য সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন প্রকার ফ্লপিডিস্কের মধ্যে 3.5 ইঞ্চি ও 2.5 ইঞ্চি ডিস্কগুলিই বহুল ব্যবহৃত। ফ্লপি ডিস্কের স্টোরেজ ক্ষমতা 1.44MB, 2.88MB ইত্যাদি হতে পারে। ফ্লপি ডিস্কের চৌম্বকতল নষ্ট হয়ে গেলে ডিস্কের সঞ্চিত তথ্য মুছে যেতে পারে, তবে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করলে ফ্লপি ডিস্ক দীর্ঘসময় ব্যবহার যোগ্য থাকে।

চিত্র ২.৩: ফ্লপি ডিস্ক

হার্ড ডিস্ক (Hard Disk)

অনেক বেশি পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন যে ম্যাগনেটিক ডিস্ক ব্যবহার করা হয় সেটি ***হার্ড ডিস্ক*** নামে পরিচিত। হার্ড ডিস্ক কম্পিউটার সিস্টেমের অন্যতম প্রধান যন্ত্রাংশ। এটি ধাতু নির্মিত এবং উভয়তলে ম্যাগনেটিক অক্সাইডের প্রলেপযুক্ত কয়েকটি চাকতি বা ডিস্কের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ধাতু নির্মিত হওয়ার কারণে এই ডিস্কগুলি যথেষ্ট শক্ত হয়, সেজন্য এর নাম হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্কের প্রতিটি ডিস্কের উভয় তলেই ডাটা ম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে সঞ্চিত হয়। হার্ড ডিস্কের, ডিস্কগুলি একটি স্পিন্ডলের (Spindle) সাথে যুক্ত থাকে যেটিকে শ্যাফট (Shaft) বলে। এই শ্যাফটটি একটি মোটরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় হার্ড ডিস্কটি তীব্র গতিতে মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। প্রত্যেকটি ডিস্কের প্রতিটি তলে ডাটা পড়া ও লেখার জন্য একটি করে Read/ Write হেড বর্তমান। হার্ড ডিস্কের সুরক্ষার জন্য এটিকে একটি ধাতব জ্যাকেটের আবরণে রেখে কম্পিউটারের মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়। সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসগুলির মধ্যে হার্ড ডিস্কের তথ্য সঞ্চয় ক্ষমতা সবথেকে বেশি এবং ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয়ক্ষমতা সম্পন্ন হার্ড ডিস্ক বাজারে পাওয়া যায়। পার্সোনাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে 320GB হার্ড ডিস্কই যথেষ্ট, তবে এর থেকে বেশি স্টোরেজ ক্ষমতার প্রয়োজন হলে আর একটি ডিস্ক যুক্ত করা যেতে পারে। প্রযুক্তির উ ন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চয়ের জন্য টেরাবাইটস বা TB স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন হার্ড ডিস্কও বাজারে পাওয়া যায়। হার্ড ডিস্কের ডিস্কগুলির গতি 3600 rpm থেকে 7200 rpm (revolution per minute) পর্যন্ত হতে পারে। তীব্রগতিসম্পন্ন এবং বিশাল সঞ্চয় ক্ষমতার কারণে হার্ড ডিস্ক যথেষ্ট দামি হয়।

চিত্র ২.৪: হার্ড ডিস্ক

অপ্‌টিক্যাল ডিস্ক (Optical Disk)

কমখরচে, ছোট আয়তনে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য অপটিক্যাল ডিস্ক খুবই কার্যকরী। এই ধরনের স্টোরেজ মাধ্যমে লেজাররশ্মি (Laser Ray) ব্যবহার করে তথ্যাদি স্টোর ও read করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অপটিক্যাল ডিস্কের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হল কমপ্যাক্ট ডিস্ক (Compact Disk) বা CD এবং ডিজিটাল ভারসেটাইল ডিস্ক (Digital versatile Disk) বা DVD।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক (Compact Disk বা CD)—ছোট আয়তনে প্রচুর তথ্য সঞ্চয় করার মাধ্যম হিসাবে কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা CD খুবই জনপ্রিয়। CD পলিকার্বনেট (Polycarbonate) প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয় এবং এর ওপর অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা প্রলেপ দিয়ে এটিকে একটি প্রতিফলক তল হিসাবে তৈরি করা হয়। কম্পিউটারের CPU ক্যাবিনেটে একটি CD ড্রাইভার বা CD প্লেয়ার থাকে

যেখানে CD টি প্রবেশ করিয়ে CD থেকে তথ্য অ্যাকসেস করা হয়। তবে CD তে তথ্য স্টোর করার জন্য CDWriterর প্রয়োজন হয়। বর্তমানে Read এবং Write উভয় কাজই করা যায় এই রকম CD Driver পাওয়া যায়। CD তে তথ্য লেখার সময় লেজার রশ্মি ঘুরন্ত ডিস্কের প্রতিফলক তলের নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে ক্ষুদ্রাকার খাঁজ বা গর্ত তৈরি করে। এইরূপ খাঁজ বা গর্তের উপস্থিতি বিট “1” এবং অনুপস্থিতি বিট “0” কে চিহ্নিত করে। CD থেকে তথ্য পড়ার জন্য CD ড্রাইভের মধ্যে CD-এর উপর কম তীব্রতাযুক্ত লেজার রশ্মি ফেলা হয়। CD ড্রাইভে উপস্থিত সেন্সর (Sensor) CD এর প্রতিফলক তল থেকে আগত প্রতিফলিত রশ্মির গতিপথ আলোক সক্রিয় করে তোলে। প্রতিফলিত আলো যদি সমতল জায়গা থেকে প্রতিফলিত হয় তবে 0 এবং যদি খাঁজ বা গর্ত থেকে প্রতিফলিত হয় তবে 1 কে চিহ্নিত করে। সাধারণতঃ CD এর সঞ্চয় ক্ষমতা 700MB বা তার বেশি হয়ে থাকে। এখানে যে ধরনের তথ্য রাখা যায় তা হল টেক্সট, শব্দ, ভিডিও, গ্রাফিক্স এবং গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন।

চিত্র ২.৫: সিডি

সাধারণত দুই ধরনের CD পাওয়া যায়। যেমন—**সি.ডি.রম (Compact Disk Read Only Memory বা CD-ROM) এবং CD-RW (Compact Disk Re-Writable)**

CD-ROM -এ তথ্য শুধু মাত্র পড়া (Read) যায়। এখানে তথ্য একবারই লেখা (Write) যায়, দ্বিতীয়বার কোন তথ্য লেখা (Write) যায় না। CD এর দাম কম এবং সর্বাপেক্ষা ব্যবহৃত স্টোরেজ মাধ্যম।

CD Re-Writable হল এক ধরনের স্টোরেজ মাধ্যম যেখানে তথ্য একাধিক বার লেখা যায় এবং সেই লেখা মোছা যায়। সেই জন্য এই ধরনের CD তুলনামূলকভাবে বেশী দামি।

ডিজিটাল ভার্সেটাইল ডিস্ক (Digital Versatile Disk বা DVD)— CD -এর থেকে অনেক বেশি স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন অপটিক্যাল ডিস্ক হিসাবে DVD বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। DVD এর বাহ্যিক আকার ও গঠন CD র মতই, কিন্তু DVD এর স্টোরেজ ক্ষমতা CD তুলনায় অনেকগুণ বেশি। বর্তমানে যে ধরনের DVD সাধারণভাবে বেশি ব্যবহৃত হয় তার স্টোরেজ ক্ষমতা 4.7GB। DVD থেকে ডাটা অ্যাকসেস করার জন্য DVD ড্রাইভারের প্রয়োজন হয়। DVD রাইটার CD রাইটারের মতই DVD তে লেখা (Write) -র কাজে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ২.৬ :সিডি ড্রাইভার

চিত্র ২.৭ : ডিভিডি

২.২.৩ ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory)

আধুনিক কম্পিউটার সিস্টেমে, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি মেমোরি ছাড়াও এক ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয় যা স্টোরেজ ক্ষমতা, দাম এবং গতি অনুসারে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির থেকে আলাদা। এগুলিকে ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) বলা হয়। ক্যাশ মেমোরি এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার মেমোরি যাকে প্রাইমারি মেমোরি বা সেকেন্ডারী মেমোরি কোন শ্রেণীর মধ্যেই ফেলা যায় না। এই মেমোরির স্টোরেজ ক্ষমতা সেকেন্ডারী মেমোরির তুলনায় খুবই স্বল্প কিন্তু তথ্য অ্যাকসেসিং এর গতি খুবই দ্রুত। ক্যাশ মেমোরি প্রসেসর ও প্রাইমারি বা মেইন মেমোরির মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করে প্রসেসিং এর গতি বৃদ্ধি করে। অন্যকথায় এই মেমোরি CPU ও প্রাইমারি মেমোরির কাজের গতির মধ্যে সমতা আনে। CPU দ্বারা বারবার ব্যবহৃত হয় এমন তথ্য ও নির্দেশসমূহ সাধারণত ক্যাশ মেমোরিতে সঞ্চিত থাকে, যাতে এই সকল তথ্য ও নির্দেশ সমূহ বারবার প্রাইমারী অথবা সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে অ্যাকসেস করতে না হয়। যেহেতু CPU ক্যাশ মেমোরি থেকে তথ্য বা

নির্দেশাবলী সরাসরি এবং যে কোনো ক্রম অনুসারে (randomly) অ্যাকসেস করতে পারে ফলে প্রসেসিং-এর গতি বৃদ্ধি পায়। ক্যাশ মেমোরি আবার দু ধরনের হতে পারে। যেমন—***প্রাইমারি ক্যাশ মেমোরি*** এবং ***সেকেন্ডারি ক্যাশ মেমোরি***। প্রাইমারি ক্যাশ মেমোরি সাধারণত CPU-র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (integrated) থাকে। অন্যদিকে, যে কোনো ডিস্ক স্টোরেজের কিছু নির্দিষ্ট অংশ ক্যাশ মেমোরি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে যদি CPU ওই অংশের সঞ্চিত তথ্য এবং প্রোগ্রাম সরাসরি বারবার অ্যাকসেস করতে পারে। এই ধরনের ক্যাশ মেমোরিকে সাধারণত সেকেন্ডারি ক্যাশ মেমোরি বলা হয়।

২.২.৪ কম্পিউটার মেমোরির একক সমূহ (Units of Computer Memory)

কম্পিউটার মূলতঃ যে ধরনের ডাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাকে ক্যারেকটার (Character) বলে। এই ক্যারেকটার যে কোন বর্ণ (alphabet), সংখ্যা (numbers) অথবা চিহ্ন (symbols) (যেমন ×,%,?,+, — ইত্যাদি) হতে পারে। ডিজিটাল কম্পিউটার বাইনারি (Binary) সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে কাজ করে যেখানে প্রতিটি ক্যারেকটার প্রসেসিং এর পূর্বে বাইনারি ডিজিট '0' কিংবা '1' এ পরিবর্তিত হয়। এই বাইনারি ডিজিটই বিট (Bit) নামে পরিচিত। কম্পিউটার মেমোরির ক্ষুদ্রতম একক হল বিট (Bit)। অর্থাৎ কোনো মেমোরি যতগুলি 0 এবং 1 স্টোর করতে পারে মেমোরির স্টোরেজ ক্ষমতা তত বিট। উদাহরণস্বরূপ, মেমোরির স্টোরেজ ক্ষমতা 65,536 বিট বলার অর্থ মেমোরিটি সর্বাধিক 65,536 টি বিট (0 কিংবা 1) স্টোর করতে পারে। চারটি বিটকে একত্রে নিব্‌ল (Nibble) বলা হয় এবং আটটি বিটকে একত্রে এক বাইট (Byte) বলা হয়। যে কোন মেমোরির সঞ্চয় ক্ষমতা 65,536 বাইট বলার অর্থ মেমোরিটি সর্বাধিক 65,536×8=5,24,288 টি বিট স্টোর করতে পারে। বাইটের থেকেও বড় একক হল কিলোবাইট (Kilo Byte) যা 1024 বাইটের সমান।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত তথ্য বা ডাটার বিভিন্ন এককসমূহ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

1 নিব্‌ল (Nibble)=4 বিট (Bits)

1 বাইট (Byte)=8 বিট (Bits)

1 কিলোবাইট বা 1KB=2^{10} বাইট =1024 বাইট (Bytes)

1 মেগাবাইট বা 1MB=2^{10} KB =1024 কিলো বাইট (Kilo bytes)

1 গিগাবাইট বা 1GB=2^{10} MB =1024 মেগাবাইট (Mega bytes)

1 টেরাবাইট বা 1TB=2^{10} GB =1024 গিগাবাইট (Giga bytes)

যেকোনো বর্ণ, সংখ্যা বা চিহ্নকে এক বাইট (Byte) তথ্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

২.৩ সফটওয়্যার (Software)

কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে সফটওয়্যার (Software) সম্বন্ধে বিশদ জানা প্রয়োজন।

কম্পিউটার দ্বারা কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য বহু নির্দেশ বা instructions একটি নির্দিষ্ট নিয়ম (logic) অনুযায়ী সজ্জিত হয়ে একটি প্রোগ্রাম (Program) তৈরি করে। এই প্রোগ্রাম বা নির্দেশাবলী কম্পিউটার হার্ডওয়্যার দ্বারা একজিকিউটেড (execute) হলে প্রয়োজনীয় কার্যটি সম্পন্ন হয়। এই রূপ এক বা একাধিক প্রোগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সফ্‌টওয়্যার যা কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, মাইক্রোসফ্‌ট ওর্য়াড (Microsoft Word) হল একটি সফ্‌টওয়্যার যা ওর্য়াড প্রসেসিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সফটওয়্যারের শ্রেণীবিভাগ ছকের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

সফ্‌টওয়্যারের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Software)

ব্যবহারের ক্ষেত্র ও কাজের উপর ভিত্তি করে সফ্‌টওয়্যারকে নিম্নলিখিত শ্রেণিসমূহে ভাগ করা যায়–

সফ্‌টওয়্যার

অ্যাপলিকেশন সফ্‌টওয়্যার | **সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার**

ইউটিলিটি সফ্‌টওয়্যার

২.৩.১ অ্যাপলিকেশন সফট্‌ওয়্যার (Application Software)

যে সকল সফ্‌টওয়্যার কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হয় সেগুলিকে অ্যাপলিকেশন সফ্‌টওয়্যার বলা হয়। অ্যাপলিকেশন সফ্‌টওয়্যার প্যাকেজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, নিম্নে কতকগুলি অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের নাম এবং এগুলি কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

- ওর্য়াড প্রসেসর (Word Proccesor) সফ্‌টওয়্যার : ওর্য়াড প্যাড (Word Pad), এম-এস-ওর্য়াড (MS-Word), ওর্য়াড স্টার (Word Star) ইত্যাদি।
- স্প্রেডশীট (Spreadsheet) সফ্‌টওয়্যার : লোটাস 1-2-3 (Lotus 1-2-3), এম-এস এক্সেল (MS-Excel) ইত্যাদি।
- ডেটাবেস (Database) সফ্‌টওয়্যার : এম-এস অ্যাক্‌সেস (MS-Access), ওরাক্‌ল (Oracle), Foxpro ইত্যাদি।
- প্রেজেন্টেশন (Presentation) সফ্‌টওয়্যার : এম.এস. পাওয়ার পয়েন্ট (MS-PowerPoint)।
- ডেস্কটপ পাবলিশিং (DTP) সফ্‌টওয়্যার : পেজমেকার (Pagemaker), কোরেল ড্র (Corel Draw) ইত্যাদি।

উপরোক্ত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলি ব্যতীত এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে যেগুলি কম্পিউটারের রুটিন কাজকর্ম এবং কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলিকে সাধারণত ***ইউটিলিটি সফটওয়্যার (utility software)*** বলা হয়। যেমন—অ্যান্টি ভাইরাস সফ্‌টওয়্যার, ব্যাকআপ সফ্‌টওয়্যার, ক্লিপবোর্ড ম্যানেজার, ফাইল মেইন্টেনেন্স সফ্‌টওয়্যার, ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টর ইত্যাদি হল ইউটিলিটি সফটওয়্যারের উদাহরণ। যে কোনো ইউজার (user) এই ইউটিলিটি সফটওয়্যারগুলি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারে।

২.৩.২ সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার (System Software)

যে সকল সফ্‌টওয়্যার কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে তাকেই সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার বলে। এই ধরনের সফ্‌টওয়্যার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যারগুলির মধ্যে ইন্টারফেস (interface) হিসাবে কাজ করে। সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরি জটিল প্রোগ্রাম যার উপস্থিতি ছাড়া কম্পিউটার কোন কাজ করতে পারে না। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম, কম্পাইলার, ট্রান্সলেটর প্রভৃতি হল সিস্টেম সফ্‌টওয়্যারের উদাহরণ।

২.৪ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (Programming Language)

কম্পিউটার কর্তৃক কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশাবলী ইনপুট হিসাবে দিতে হয় এবং এইসব তথ্য এবং নির্দেশাবলী অবশ্যই কম্পিউটার সিস্টেমের বোধগম্য হতে হবে। অন্যথায় কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। যেহেতু ব্যবহারকারীর (user)

ভাষা কম্পিউটার বোঝে না, তাই এমন ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা প্রয়োজন যা কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। এই ভাষা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট নিয়মে প্রোগ্রাম লেখা হয় যা কম্পিউটারের বোধগম্য হয়। এই রকম ভাষাকেই ***কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ*** বা ***প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ*** বলে। অন্যকথায় বলা যায়, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ হল এমন একটি ভাষা যার মাধ্যমে কম্পিউটার মেশিনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব। প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কিছু ব্যাকরণজনিত (grammatical বা syntactical) এবং লজিক্যাল (symantical) নীতি (rule) নির্দিষ্ট থাকে। যে কোনো একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখতে হলে ব্যবহারকারীকে (user) ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সমস্ত ব্যাকরণজনিত এবং লজিক্যাল নিয়মনীতি মেনে প্রোগ্রাম লিখতে হয়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দুই প্রকারের হয়, যেমন— লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (low level language) ও হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (high level language)। নীচে এগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

- **লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ—** এই ল্যাঙ্গুয়েজে মূলতঃ বাইনারি বিট অর্থাৎ শুধুমাত্র 0 ও 1 এর সাহায্যে প্রোগ্রাম লেখা হয়। এই ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে লেখা প্রোগ্রাম সরাসরি কম্পিউটারের বোধগম্য হয়। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ (Assembly language) হল একটি লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ।

- **হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ—** সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে প্রোগ্রাম লেখার জন্য ব্যবহৃত ল্যাঙ্গুয়েজেই *হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ* নামে পরিচিত। এই ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিনের দ্বারা সরাসরি বোধগম্য নয়, বরং হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা প্রোগ্রাম কম্পিউটারের তুলনায় প্রোগ্রামারের কাছে বেশি বোধগম্য। এই কারণে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বোধগম্য করার জন্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তিত হয় কার্য সম্পাদনের আগে।

BASIC, FORTRAN, COBOL, LOGO, C, C++ ইত্যাদি হল হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ।

নিম্নে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের শ্রেণীবিন্যাস ছকের আকারে দেখানো হয়েছে।

প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (Programming Language)

- **লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (Low-level Language)**
  - **মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ (Machine Language)**
  - **অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ (Assembly Language)**
- **হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (High-level Language)**
  - **কম্পাইলার বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ (Compiler-based Language)**
  - **ইনটারপিটার বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ (Interpreter based Language)**

২.৪.১ ট্রান্সলেটর (Translator)

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত প্রোগ্রাম লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ পরিবর্তিত হওয়ার পরই কম্পিউটারের বোধগম্য হয়। ট্রান্সলেটর একটি সফ্‌টওয়্যার যা হাইলেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত প্রোগ্রামকে লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তনের কাজটি করে। ট্রান্সলেটর দুই ধরনের হয়, যেমন— ইন্টারপ্রিটার এবং কম্পাইলার।

(a) **ইন্টারপ্রিটার (Interpreter)—** ইন্টারপ্রিটার কোন প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইনকে এক এক করে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিবর্তিত করে। সোর্স কোড (হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত প্রোগ্রাম) বিশ্লেষণ (analysis) করতে ইন্ট্রারপ্রিটার কম সময় নিলেও সামগ্রিকভাবে প্রোগ্রাম একজিকিউশনের (execution) গতি তুলনামূলক ভাবে কম। সোর্স কোডের কোনো লাইনে ভুল (error) থাকলে প্রোগ্রাম একজিকিউশন (execution) ওই লাইনে এসে থেমে যায়। তাই এক্ষেত্রে ভুল সংশোধন বা প্রোগ্রাম ডিবাগিং (Debugging) করা সহজ হয়। বেসিক (BASIC), পাইথন (Python), রুবি প্রভৃতি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটারের সাহায্যে কোনো প্রোগ্রামকে কম্পিউটারে একজিকিউশনের উপযোগী কোডে (code) পরিবর্তিত করে।

(b) **কম্পাইলার (Compiler)**

কম্পাইলার সমগ্র প্রোগ্রামটিকে একসঙ্গে স্ক্যান করে প্রথমে একটি অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে এবং তারপরে একটি একজিকিউশন (execution) প্রোগ্রাম তৈরি করে প্রোগ্রাম একজিকিউট (execute) করে। এক্ষেত্রে সোর্স কোড বিশ্লেষণ করতে সময় বেশি লাগলেও সামগ্রিকভাবে প্রোগ্রাম একজিকিউশনের (execution) গতি তুলনামূলক ভাবে দ্রুত। সোর্স কোডে যতগুলি ভুল থাকে তা একেবারে অবজেক্ট ফাইল তৈরির সময় ব্যবহারকারীকে জানানো হয়। তাই এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ডিবাগিং তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়। COBOL, C, C++ ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত পোগ্রাম একজিকিউশনের জন্য কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়।

২.৫ অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)

অপারেটিং সিস্টেম বা OS (Operating System) হল একটি সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার যা কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ (Hardware) এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটারের সামগ্রিক কাজকর্ম পরিচালনা করে। অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং হার্ডওয়্যার ব্যবহারের নানা সুবিধা প্রদান করে। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম হল— ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (Disk Operating System বা DOS), উইন্ডোজ (Windows), লিনাক্স (Linux) ইত্যাদি।

অপারেটিং সিস্টেম অনেকগুলি সফ্‌টওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত যাদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্টভাবে এক একটি কাজ করে থাকে। কম্পিউটার চালু হওয়ার সাথে সাথে অপারেটিং সিস্টেম (OS) প্রাইমারী মেমোরি (RAM) পরীক্ষা করে দেখে নেয় RAM-এ কত জায়গা আছে এবং স্টার্ট আপ ডিস্ক (Start-up disk) (যে ডিস্কে সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার আছে) খুঁজে সেখান থেকে সিস্টেম ফাইলের প্রয়োজনীয় অংশ RAM-এ লোড করে। এর পাশাপাশি OS কম্পিউটার সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদির কাজকর্ম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এইভাবে OS সমগ্র কম্পিউটার সিস্টেমকে ব্যবহারকারীর (user) কাজের উপযোগী করে তোলার পর ব্যবহারকারীর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে। অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং কম্পিউটার ইউজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তা নীচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

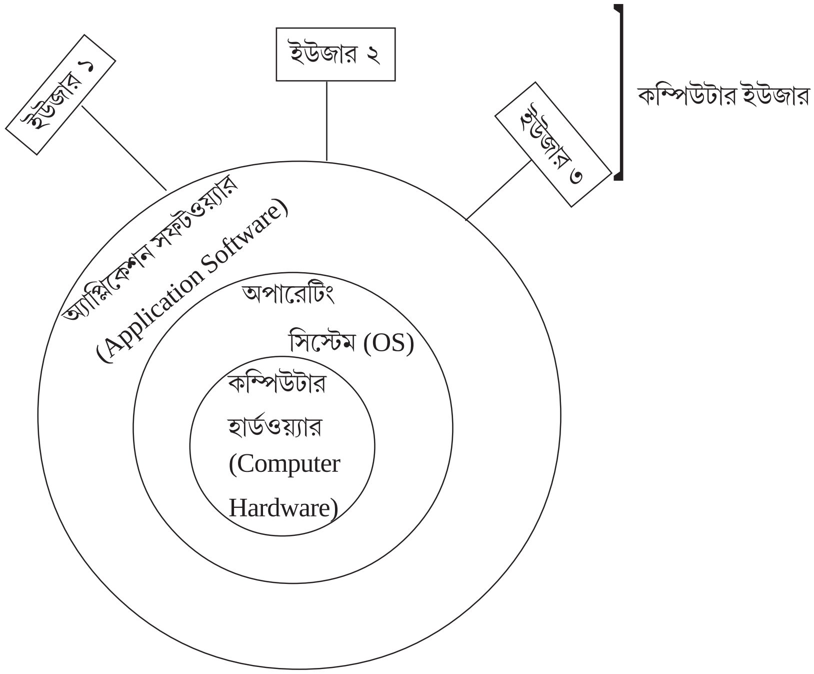

চিত্র ২.৮: কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস

২.৫.১ প্রোগ্রাম একজিকিউশন (Program Execution)

এখানে অপারেটিং সিস্টেমের সহায়তায় কোনো প্রোগ্রাম বা টাস্ক কম্পিউটার সিস্টেমে কিভাবে প্রসেস হয় সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে কোনো একটি কার্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে একজিকিউটেড হতে পারে। কার্য সম্পাদনের জন্য, অপারেটিং সিস্টেম সাধারণত তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এগুলি হল সিরিয়াল প্রসেসিং, ব্যাচ প্রসেসিং এবং মাল্টি প্রোগ্রামিং। এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সিরিয়াল প্রসেসিং (Serial Processing)

সিরিয়াল প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে নির্দেশসমূহ (instructions) পর্যায়ক্রমে (serially) পালিত হয়। যে নির্দেশ প্রথমে দেওয়া হয় সিস্টেম তা প্রথমে একজিকিউট (execute) করে এবং তারপর পরবর্তী নির্দেশসমূহ পর্যায়ক্রমে একজিকিউটেড হয়। কোন সোর্স প্রোগ্রাম প্রথমে অবজেক্ট (object) প্রোগ্রামে পরিবর্তিত হয় এবং এরপর তা লোডার (Loader) এর সাহায্যে কম্পিউটারের প্রাইমারী মেমোরিতে লোড হয়। এরপর প্রোগ্রামটি একজিকিউটেড (executed) হতে শুরু করে এবং কম্পিউটারের মনিটরে এর ফলাফল প্রদর্শিত হয় অথবা প্রিন্টারের সাহায্যে প্রিন্ট করা হয়। মেমোরিতে লোড হয়ে যাবার পর প্রোগ্রামটিকে যতবার খুশি একজিকিউট (execute) করা যায় এবং ব্যবহারকারীর ইনপুট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফলাফলও পরিবর্তিত হয়। সিরিয়াল প্রসেসিং এর মূল সমস্যা হল এই পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম একজিকিউশন অত্যন্ত ধীরগতিতে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রসেসিং এর উপর নির্ভর করতে হয়।

ব্যাচ প্রসেসিং (Batch Processing)

এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম একজিকিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রথমে পরপর সাজানো হয়। এরপর একই ধরনের কাজগুলিকে এক একটি ব্যাচে (Batch) একত্রিত করে তা একজিকিউটেড হয়। ব্যাচ আকারে বিভিন্ন কাজ প্রসেস হওয়ার ফলে কম্পিউটার সিস্টেমের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে আরও বেশি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায়। এই সিস্টেমের মূল সমস্যা হল দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রসেসর এবং তুলনামূলক মন্থরগতির ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রের মধ্যকার গতির ব্যবধান। যার ফলে যদি কোন একটি কাজ একজিকিউটেড হওয়ার কোনো পর্যায়ে ইনপুটের জন্য অপেক্ষা করে তাহলে ওই ইনপুট লোড হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রসেসর কর্মহীন হয়ে বসে থাকে।

মাল্টি প্রোগ্রামিং (Multi Programming)

ব্যাচ প্রসেসিং এর দ্বারা কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে অধিক মাত্রায় কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হলেও ব্যাচ প্রস্তুতির সময় CPU কর্মহীন (idle) থাকে। একক ব্যবহারকারীর (single user) পক্ষে কখনোই CPU বা ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রাংশগুলিকে সর্বদা ব্যস্ত রাখা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে মাল্টি প্রোগ্রামিং খুবই কার্যকরী যেখানে একাধিক প্রোগ্রামকে একসাথে রান করার মাধ্যমে CPU বা ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রাংশগুলিকে অনেক বেশি মাত্রায় ব্যস্ত রাখা সম্ভব হয়। মাল্টি প্রোগ্রামিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার সিস্টেমের মেইন মেমোরিতে একাধিক প্রোগ্রাম লোড করা হয়। অপারেটিং সিস্টেম এই প্রোগ্রামগুলির মধ্য থেকে একটি প্রোগ্রাম রান (run) করতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমিক একজিকিউশনের (Sequential Execution) ক্ষেত্রে CPU মাঝে মাঝে কর্মহীন হয়ে পড়ে তবে মাল্টি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে CPU অন্য প্রোগ্রাম একজিকিউট (execute) করতে পারে। ফলতঃ CPU-কে অধিক মাত্রায় ব্যস্ত রাখা সম্ভব হয়।

২.৫.২ অপারেটিং সিস্টেমের কার্যসমূহ (Functions of Operating System)

অপারেটিং সিস্টেম প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি ছোটো ছোটো সফ্টওয়্যারের সমষ্টি এবং এই সফ্টওয়্যারগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। অপারেটিং সিস্টেম সামগ্রিকভাবে যে কাজগুলি সম্পন্ন করে সেগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট (Processor Management)

মাল্টি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেম স্থির করে কার্য সম্পাদনের সময় কোন প্রোগ্রাম প্রসেসরকে কত সময় ধরে ব্যবহার করতে পারবে। কোনো প্রোগ্রাম একজিকিউশনের সময় প্রসেসরকে সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করাই হল ***প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট***। বর্তমানে কম্পিউটারে মূল প্রসেসরকে সাহায্য করার জন্য একাধিক কো-প্রসেসর (co-processor) থাকে। যেমন— ম্যাথ কো-প্রসেসর

(কোন গাণিতিক কাজের জন্য), গ্রাফিক্স কো-প্রসেসর (গ্রাফিক্সের কাজের জন্য) ইত্যাদি। মূল প্রসেসরের সঙ্গে এই কো-প্রসেসরগুলির যথাযথ ব্যবহার প্রোগ্রাম একজিকিউশনের (execution) গতিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কম্পিউটারকে কোন কাজ দিলে অপারেটিং সিস্টেম ঐ কাজকে প্রসেসর ও কো-প্রসেসরগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং এর ফলে কাজটি অনেক কম সময়ে সম্পূর্ণ হয়।

মেমোরি ম্যানেজমেন্ট (Memory Management)

অপারেটিং সিস্টেম, কম্পিউটারের মেমোরির কত অংশ সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হবে, কত অংশ ব্যবহারকারীর প্রদত্ত ডাটা বা প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দ হবে এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করে। একাধিক প্রোগ্রাম একসঙ্গে রান করার সময় কোন্ প্রোগ্রামের জন্য মেমোরির কোন্ অংশ কি পরিমাণে বরাদ্দ হবে তাকেই বলা হয় ***মেমোরি ম্যানেজমেন্ট***। মেমোরি ম্যানেজমেন্টের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল প্রোটেকশন (Protection) এবং শেয়ারিং (Sharing)। প্রোটেকশন হল প্রত্যেক মেমোরি অ্যাড্রেসের মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখা যাতে একাধিক প্রসেস একই মেমোরি অ্যাড্রেসে লোড না হয়। শেয়ারিং হল কোনো কমন (common) তথ্য একাধিক প্রসেস দ্বারা সমানভাবে ব্যবহৃত হওয়া। মেমোরিতে যদি কোন প্রসেস ইনঅ্যাকটিভ (inactive) থাকে তবে শেয়ারিং এর কাজ হল তাকে সরিয়ে মেমোরির ওই অংশে কোন অ্যাকটিভ (active) প্রসেস লোড করা।

ফাইল ম্যানেজমেন্ট (File Management)

ফাইল ম্যানেজমেন্ট হল সেকেন্ডারি মেমোরিতে রাখা বিভিন্ন তথ্য ও প্রোগ্রামকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। অপারেটিং সিস্টেমের ফাইল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামগুলি ব্যবহারকারীর প্রোগ্রামকে অন্যান্য ফাইল পড়তে, লিখতে অথবা নতুন ফাইল তৈরি করতে সাহায্য করে।

ইনপুট / আউটপুট ম্যানেজমেন্ট (Input / Output Management)

ইনপুট / আউটপুট ম্যানেজমেন্টের সাহায্যে অপারেটিং সিস্টেম কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্র সমূহের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন I/O যন্ত্রের জন্য কমান্ড সরবরাহ এবং নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করে। আবার যন্ত্রগুলির কোন ত্রুটি আবিষ্কার করে (error) তা সংশোধন করাও অপারেটিং সিস্টেমের কাজ।

সিকিওরিটি ম্যানেজমেন্ট (Security Management)

অপারেটিং সিস্টেমের এই বৈশিষ্ট্য সঞ্চিত তথ্যকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটানো থেকে রক্ষা করে। সিকিওরিটি ম্যানেজমেন্টের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) একই স্থানে একই নামে একটির অধিক ফাইল বা ফোল্ডার তৈরি করা যায় না।

(ii) পাসওয়ার্ডের (Password) সাহায্যে বিভিন্ন ফাইল বা ফোল্ডারকে সুরক্ষিত করা যায়।

(iii) একই মেমোরি অ্যাড্রেসে একাধিক ফাইল তৈরি করা যায় না।

ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট (Device Management)

অপারেটিং সিস্টেমের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্রগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। কম্পিউটার অন্ করার প্রথম দিকেই অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রাংশগুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন অপারেটিং সিস্টেম কী-বোর্ডকে ইনপুট ডিভাইস ও মনিটরকে আউটপুট ডিভাইস হিসাবে শনাক্ত করে। এর ফলে কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক যন্ত্র কম্পিউটার চলাকালীন অবস্থায় একটিকে খুলে নতুন আর একটিকে লাগানো যায় না। কম্পিউটার বন্ধ করার পর নতুন যন্ত্রটি লাগিয়ে আবার কম্পিউটারকে চালু করতে হয়।

২.৫.৩ প্রচলিত অপারেটিং সিস্টেম সমূহ (Common Operating Systems)

বর্তমানে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম বাজারে পাওয়া যায় যার মধ্যে কিছু প্রচলিত এবং বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমের বর্ণনা নীচে দেওয়া হয়েছে।

ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (Disk Operating System)

ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (Disk Operating System বা DOS) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র

রচনা করে ব্যবহারকারীকে 'টেক্সট' ভিত্তিক কমান্ড ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কাজের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে। মাইক্রোসফ্‌ট DOS বা MS-DOS, যা মাইক্রোসফ্‌ট্ কর্পোরেশন ১৯৮১ সালে বিশেষভাবে IBM-PC-র জন্য তৈরি করেছিল তারই বিভিন্ন সংস্করণ অধিক প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। মাইক্রোসফ্‌ট ছাড়া IBM কোম্পানিও DOS তৈরি করে যা PC-DOS নামে পরিচিত। DOS এর মূল কাজগুলি হল:

(i) বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যখন কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় তখন তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা।

(ii) ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট করা অর্থাৎ ডিস্ককে তথ্য স্টোর করার উপযোগী করে তোলা (যেমন-ডিস্ককে ফরম্যাট করা, কপি করা ইত্যাদি)

(iii) স্বয়ংক্রিয় একজিকিউশন অথবা ব্যাচ (batch) প্রসেসিং অর্থাৎ EXE বা BAT ফাইলের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে করতে সাহায্য করা।

(iv) Print Management এবং Resource Management-এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিয়ন্ত্রণ করা।

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (Windows Operating System)

DOS এ সব কাজই কমান্ড লিখে করতে হয়, যার ফলে ব্যবহারকারীকে প্রচুর নির্দেশ এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি মনে রাখতে হয়। এই অপারেটিং সিস্টেমে গ্রাফিক্স বা ছবির সাহায্যে কোনো নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এইসব কারণে DOS-এর জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। DOS-এর এই সব সীমাবদ্ধতা দূর করেই তৈরি হয়েছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। মাইক্রোসফ্‌ট কোম্পানির তৈরী উইন্ডোজের প্রথম সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৫ সালে। তবে এই সংস্করণে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৯২ সালে Windows 3.1 হল উইন্ডোজের প্রথম সফল সংস্করণ। ১৯৯৫ সালে মাইক্রোসফ্‌ট Windows 95 বাজারে আনে যা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। Windows এর পরবর্তী সংস্করণগুলি হল Windows 97, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows 7, এবং Windows 8। Windows এর সর্বশেষ সংস্করণটি হল Windows 10.

উইন্ডোজ ব্যবহারের সুবিধাগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

(i) Graphical User Interface বা GUI : Windows হল একটি GUI যার ফলে এখানে DOS এর মত কোন কমান্ড লিখতে বা মনে রাখতে হয় না। ছবির মাধ্যমে নির্দেশ, তথ্য ইত্যাদি দেওয়ার সুবিধা থাকায় মাউস ক্লিক করে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা যায়।

(ii) Object Linking and Embedding (OLE) : OLE এর সাহায্যে Windows-এ কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশন থেকে বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে অন্য অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করা যায় এবং বিষয়বস্তু দুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনও করা যায়। ফলে একটি বিষয়বস্তুতে কোন পরিবর্তন করা হলে তা নিজে থেকেই অপর বিষয় বস্তুতে পরিবর্তন সাধন করে।

(iii) Multi-user এর সুবিধা : Windows এর উন্নততর সংস্করণগুলিতে (Windows NT, Windows XP) একই সাথে একাধিক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে।

(iv) Multitasking এর সুবিধা : Windows অপারেটিং সিস্টেমে কোনো user একই সাথে একাধিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

(v) Dynamic Data Exchange (DDE) : DDE এর সুবিধা থাকায় Windows-এ চলে এরকম সফ্‌টওয়্যারগুলির মধ্যে ডাটা আদান প্রদান করা সম্ভব হয়।

(vi) Open Database Connectivity (ODBC) : Windows-এ ODBC-কে কাজে লাগিয়ে কোনো অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা তৈরি করা ডাটাবেসের সাহায্যে অন্য অ্যাপ্লিকেশন যেমন তৈরি করা যায় তেমনই একে অন্য অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারও করা যায়।

(vii) Plug and Play : এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রাংশগুলি যেমন CD-ড্রাইভ, মনিটর, সাউন্ড কার্ড, স্পীকার প্রভৃতি যোগ করার জন্য আলাদাভাবে কোনো সফ্‌টওয়্যার ইনস্টল করার দরকার হয় না।

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম (Linux Operating System)

Windows এর মতই Linuxও একটি Multi user, Multi tasking অপারেটিং সিস্টেম। কাজের ভিত্তিতে এই অপারেটিং সিস্টেমকে চারটি লেয়ারে (layer) ভাগ করা যায় — কার্ণেল (kernel), শেল (shell), ফাইল স্ট্রাকচার (file structure) এবং ইউটিলিটিস (utilities)। এগুলির মধ্যে মূলভাগ হল কার্ণেল যা প্রোগ্রামকে চালায় এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যারগুলিকে পরিচালনা করে। ১৯৯২ সালে, লিনাস টোর ভাল্ড কার্নেল বাজারে আনেন। GNU নামের একটি সংস্থা কার্ণেলের সাথে শেল, ফাইল স্ট্রাকচার, ইউটিলিটিস যোগ করে একে একার্থে সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমের রূপ দেয়। শেল ব্যবহারকারীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। এটি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং নির্দেশগুলিকে কার্ণেলের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফাইল স্ট্রাকচার ঠিক করে ডিস্কের মধ্যে ফাইল কীভাবে সংরক্ষিত হবে। প্রথমদিকে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম কমান্ড বেস্‌ড্‌ই ছিল। বর্তমানে লিনাক্সে GUI ব্যবহার করা হচ্ছে। লিনাক্সের প্রধান বিশেষত্ব হল এটি একটি open source অপারেটিং সিস্টেম। এটি open source হওয়ায় সবাই এটিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনমত পরিবর্তনও করতে পারে। লিনাক্স ইন্টারনেটে সহজ প্রাপ্য এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় এটিকে নিজের মেশিনে ডাউনলোড করার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো খরচ করতে হয় না। যদি লিনাক্সের CD বাজার থেকে কিনতে হয় তার খরচও অনেক কম। ভাইরাস আক্রমণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের তুলনায় লিনাক্স অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ও নিরাপদ।

২.৬ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network)

দুই বা তার অধিক autonomous কম্পিউটার যখন বিশেষ কোন মাধ্যম দ্বারা নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে সক্ষম হয় তখন সমগ্র সিস্টেমটিকে ***কম্পিউটার নেটওয়ার্ক*** বলা হয়। নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলি autonomous হওয়ার অর্থ হল একটি কম্পিউটার থেকে অন্য একটি কম্পিউটারকে কখনোই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলির সংযোগ মাধ্যম কেবল, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্, মাইক্রোওয়েভ, উপগ্রহ ইত্যাদি হতে পারে। নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলিকে নোড (Node) বা ওয়ার্ক স্টেশন (work station) বলা হয় এবং সংযোগ মাধ্যমটিকে বলা হয় Communication Channel। শুধু কম্পিউটারই নয় অন্যান্য পারিপার্শ্বিক যন্ত্রাদিও (Peripherals) নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যুক্ত থাকতে পারে। নেটওয়ার্কের সুবিধাজনক বিষয় হল সংযুক্ত কম্পিউটারগুলি বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে তথ্যের আদান প্রদান হয় তা লিখিত টেক্সট, শব্দ, ছবি ইত্যাদি হতে পারে। নেটওয়ার্কের নোড গুলি সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারে। তবে সেগুলির মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলে নেটওয়ার্ক কাজ করে না। নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন।

২.৬.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা (Advantages of Computer Network)

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

রিসোর্স শেয়ারিং (Resource Sharing) : বিভিন্ন প্রোগ্রাম, দামি যন্ত্রাংশ (যেমন প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি) এবং ডাটা বা তথ্য নেটওয়ার্কে অবস্থিত সমস্ত কম্পিউটার থেকে ব্যবহারকারীরা (user) ব্যবহার করতে পারে।

হাই রিলায়েবিলিটি (High Reliability) : যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি নেটওয়ার্কের একাধিক কম্পিউটারে স্টোর করে রাখা যায়, ফলে কোন একটি কম্পিউটার বিকল হলে অন্য একটি থেকে ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ তথ্যের বিকল্প উৎস থাকায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা উচ্চমানের হয়।

স্কেলেবিলিটি (Scalability) : কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের কার্য্যক্ষমতা ও দক্ষতা একই রাখতে বা বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত প্রসেসর ব্যবহার করা যায়। এর ফলে অতিরিক্ত ওয়ার্ক লোড সামাল দেওয়া যায়।

ইজি কমিউনিকেশন (Easy Communication) : নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বিভিন্ন সংস্থা সহজেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্যাদি আদান প্রদান করতে পারে। ই-মেল, ভিডিও কনফারেন্স, চ্যাটিং ইত্যাদি নেটওয়ার্ক পরিসেবা ব্যবহার করে একজন অন্যের সঙ্গে যে কোনো সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

হাই সিকিউরিটি (High Security) : নেটওয়ার্কে তথ্য যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলেই তা নষ্ট করে দিতে পারে না।

আর্থিক লেনদেন (Money Transaction) : নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি সহজেই তার বিভিন্ন বিল পেমেন্ট, ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ও লগ্নি ম্যানেজ করা ইত্যাদি কাজগুলি করতে পারে। বর্তমানে শেয়ার বাজার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ছাড়া অচল।

হোম শপিং (Home Shopping) : নেটওয়ার্কে উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায়।

তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার (Information Collection and Use) : ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়, যেমন শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, ভ্রমণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ, জ্ঞান লাভ ও ব্যবহার করা বর্তমানে খুবই সহজ।

বিনোদন (Entertainment) : চিত্ত বিনোদনে নেটওয়ার্ক পরিসেবার ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান শোনা, সিনেমা দেখা, গেম খেলা ইত্যাদি এখন খুবই সহজ ব্যাপার।

২.৬.২ নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার (Network Architecture)

কোনো নেটওয়ার্কে কী ধরনের কম্পিউটার আছে, নেটওয়ার্কটি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, নেটওয়ার্কের আকার কত বড়, কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে কিনা, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত — ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network) এবং পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer-to-Peer Network)। নিম্নে এগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network)

এই ধরনের নেটওয়ার্কে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং উচ্চ স্টোরেজ ক্ষমতা যুক্ত কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে যাকে বলা হয় ***সার্ভার (Server)***। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য, হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার শেয়ার করার জন্য এবং তথ্যের সুরক্ষার জন্য এই সার্ভারকে ব্যবহার করা হয়। নেটওয়ার্কের অন্যান্য কম শক্তিশালী কম্পিউটার বা ওয়ার্কস্টেশনসমূহ এই সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তাদের বলা হয় ***ক্লায়েন্ট (client)***। ব্যবহারকারী ক্লায়েন্টের মাধ্যমেই সার্ভার প্রেরিত তথ্য অ্যাকসেস করতে পারে। ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক মূলত ব্যবহৃত হয় ডাটা এবং রিসোর্স শেয়ারিং এর জন্য। প্রায় সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা ও সফ্টওয়্যার সার্ভারে রাখা থাকে। সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলি এই ডাটা ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে পারে। তবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি লাগে এবং তার জন্যে সার্ভারে প্রত্যেক ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও পাসওয়ার্ড থাকে। কাজ অনুসারে সার্ভার বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন ফাইল সার্ভার, প্রিন্ট সার্ভার, মেসেজ সার্ভার, ডাটাবেস সার্ভার, অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার ইত্যাদি।

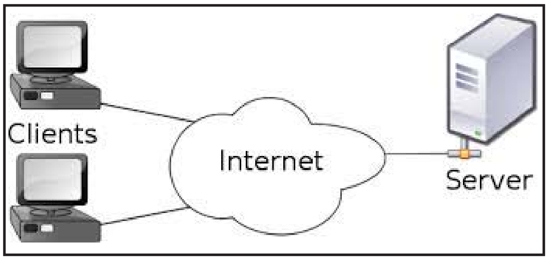

চিত্র ২.৯ : ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক

ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুবিধা ঃ

(i) এই ধরনের নেটওয়ার্কের সমস্ত কম্পিউটার সার্ভার থেকে ডেটা, প্রোগ্রাম ও প্রিন্টারকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারে।

(ii) এই ধরনের নেটওয়ার্কে সার্ভার সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটিকে পরিচালনা করে বলে নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি অনেক সহজ হয়।

(iii) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাটা ও সফ্টওয়্যারের নিয়ন্ত্রণ System Administrator এর হাতে থাকে বলে এই নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ব্যবস্থাটি সুদৃঢ় হয়। ফলে নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটার এগুলিকে বদলাতে বা নষ্ট করতে পারে না।

(iv) বেশির ভাগ ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে সার্ভারের ব্যাক আপ (backup) নেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়।

(v) ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কের সার্ভারে একাধিক ডিস্ক থাকে, কাজেই একটি ডিস্ক কোনো কারণে নষ্ট হলে অন্য ডিস্ক ব্যবহার করা যায়।

(vi) একটি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে কয়েক হাজার ব্যবহারকারী থাকতে পারে। এত বেশী সংখ্যক ব্যবহারকারী পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কে থাকতে পারে না।

অসুবিধা ঃ

(i) এই ধরনের নেটওয়ার্কে সমগ্র নেটওয়ার্কটি সার্ভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সার্ভার ডাউন হয়ে গেলে সমগ্র নেটওয়ার্কটি বিকল হয়ে পড়ে।

(ii) এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাটি জটিল। সার্ভারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা, নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য সেটিকে configure করা, সার্ভার প্রোগ্রামগুলিকে configure করা, সুরক্ষা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা — এই সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম লাগে।

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)

এই ধরনের নেটওয়ার্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোনো সার্ভার থাকে না এবং নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটারেই একই রকম গুরুত্ব ও দায়িত্ব বর্তমান। প্রতিটি কম্পিউটারই একই সঙ্গে সার্ভার ও ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। কোনো একটি কম্পিউটারের ডিস্কে যে ডাটা থাকে সেগুলি শেয়ার করার অনুমতি দিলে তবেই অন্য কম্পিউটারগুলি সেই ডাটা ব্যবহার করতে পারে বা ডাটা বিনিময় করতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নীচে লিপিবন্ধ করা হয়েছে।

সুবিধা ঃ

(i) এই নেটওয়ার্কের গঠন খুব সহজ ও সরল।

(ii) এই ধরনের নেটওয়ার্কে কোন সার্ভারের প্রয়োজন হয় না এবং এছাড়া আলাদাভাবে কোনো সফ্টওয়্যার ইনস্টল করা বা সেগুলিকে নেটওয়ার্কের জন্য configure করার কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই System Administrator এরও কোনো প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা ঃ

(i) পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

(ii) এই ধরনের নেটওয়ার্কে ডাটা সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।

(iii) পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে পুরো নেটওয়ার্কের ডেটার ব্যাক আপের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য আলাদাভাবে ব্যাকআপ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

(iv) এই ধরনের নেটওয়ার্ক খুব বেশী দূরত্বের জন্য আদর্শ নয়।

(v) খুব বেশী সংখ্যক ব্যবহারকারী এই ধরনের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে না।

২.৬.৩ নেটওয়ার্ক টোপোলজি (Network Topology)

কোনো নেটওয়ার্কের কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে গেলে প্রথমে সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। একটি নেটওয়ার্কে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি কীভাবে যুক্ত করা হবে তার জ্যামিতিক বিন্যাসকে বলা হয় ***নেটওয়ার্ক টোপোলজি***। নেটওয়ার্ক টোপোলজি নিম্নলিখিত ধরনের হতে পারে। যেমন —

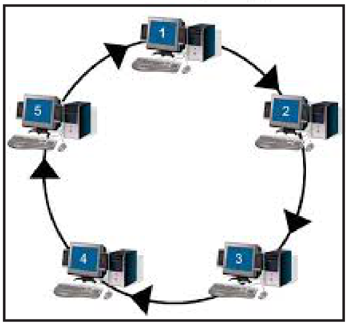

চিত্র ২.১০ : নেটওয়ার্ক টোপোলজি

- বাস টোপোলজি (Bus Topology)
- স্টার টোপোলজি (Star Topology)
- রিং টোপোলজি (Ring Topology)
- মেশ টোপোলজি (Mesh Topology) ও
- ট্রি টোপোলজি (Tree Topology)

বিভিন্ন ধরনের টোপোলজির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও বিভিন্ন ধরনের হয়। এছাড়া নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে ডেটা আদান প্রদান পদ্ধতি ও বিভিন্ন টোপোলজির জন্য আলাদা হয়। সুতরাং কোনো একটি নেটওয়ার্কের জন্য যথাযথ টোপোলজি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৬.৩.১ বাস টোপোলজি (Bus Topology)

বাস টোপোলজি হল সবচেয়ে সরল টোপোলজি। এক্ষেত্রে একটি মূল তারের সঙ্গে কম্পিউটারগুলি যুক্ত থাকে। এই মূল তারটিকে বলা হয় ট্রাঙ্ক (Trunk) বা ব্যাকবোন (Backbone)। এই টোপোলজিতে একটি কম্পিউটার থেকে আর একটি কম্পিউটারের অ্যাড্রেসে ইলেকট্রনিক সংকেতের মাধ্যমে ডাটা পাঠানো হয়। এই সংকেত ট্রাঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যে কম্পিউটারের অ্যাড্রেসের সঙ্গে ডেটার অ্যাড্রেস মিলে যায়, সেই কম্পিউটারে ডেটা চলে যায়। বাস টোপোলজিতে একই সময়ে একটি কম্পিউটারই ডাটা পাঠাতে পারে। তাই কোনো একটি কম্পিউটার ডাটা পাঠানো শুরু করলে অন্য কম্পিউটারগুলিকে অপেক্ষা করতে হয়। নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা যত বাড়ে এই queue-র পরিমাণ তত বাড়তে থাকে, ফলে ডাটা পাঠাতে দেরী হয়। বাস টোপোলজিতে একটি কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেলেও অন্যান্য কম্পিউটারে ডাটা পাঠাতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ট্রাঙ্কের কোনো একটি অংশ যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে সেই অংশের পর থেকে নেটওয়ার্কে যতগুলি কম্পিউটার আছে সেগুলি আগের কম্পিউটারগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। বাস কেবল একাই সব নোডকে যুক্ত রাখে, ফলে এই টোপোলজিতে ছোটো দৈর্ঘ্যের কেব্‌লের প্রয়োজন হয়। বাস টোপোলজি সরল হলেও দোষ বা ত্রুটি খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।

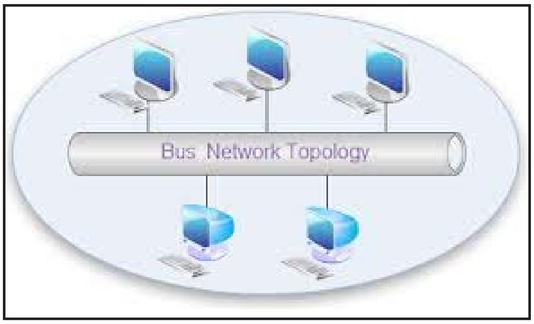

চিত্র ২.১১: বাস টোপোলজি

২.৬.৩.২ স্টার টোপোলজি (Star Topology)

স্টার টোপোলজির ক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলি একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই কেন্দ্রীয় ডিভাইসটিকে হাব (Hub) বলা হয়। হাব এখানে নেটওয়ার্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে কম্পিউটার ডাটা পাঠায়, সেই কম্পিউটার থেকে সংকেত প্রথমে হাব-এ আসে এবং তারপর হাব থেকে অন্য কম্পিউটারে যায়। স্টার টোপোলজির একটি সুবিধা হল ডাটা আদান প্রদান হাব-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি আবার অসুবিধারও বটে কারণ হাব কাজ না করলে পুরো নেটওয়ার্কটিই বিকল হয়ে (Down) যায়। তবে, বাস টোপোলজির মতো এখানেও কোনো একটি কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেলেও নেটওয়ার্ক কাজ করে। স্টার টোপোলজিতে অতিরিক্ত কম্পিউটার যুক্ত করা যায়। একটি হাব-এ সাধারণতঃ 8টি, 16টি বা 32টি কম্পিউটার লাগানো যায়। এর চেয়ে বেশি কম্পিউটার যুক্ত করতে হলে হাবটির সঙ্গে আর একটি হাব লাগিয়ে নিতে হয়। দ্বিতীয় হাবটিতে আবার অনেকগুলি কম্পিউটার লাগানো যায়। এইভাবে একাধিক হাব লাগিয়ে নেটওয়ার্কটির পরিধি বাড়ানো যায়।

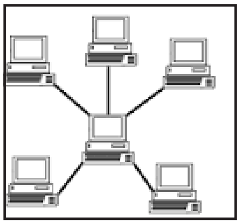

চিত্র ২.১২: স্টার টোপোলজি

২.৬.৩.৩ রিং টোপোলজি (Ring Topology)

রিং টোপোলজিতে কম্পিউটারগুলি পরস্পরের সঙ্গে বৃত্তাকারে যুক্ত থাকে। বৃত্তাকার বলে বাস টোপোলজির মত এখানে কোন

মুক্ত প্রান্ত থাকে না। এই টোপোলজিতে কোনো একটি কম্পিউটার থেকে যে সংকেত পাঠানো হয় সেটি নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটারের মধ্যে দিয়ে যায়। ফলে সংকেতের ওপর প্রতিটি কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। কোনো একটি কম্পিউটারে সংকেত আসার পর, সেই কম্পিউটার সংকেতটিকে ছাড়লে তবে তা পরের কম্পিউটারে যেতে পারে। রিং এর মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেকটি ডিভাইসের সঙ্গে একটি করে রিপিটার যুক্ত থাকে। যদি কোনো কম্পিউটার কোনো সংকেত গ্রহণ করে ও দেখে যে সংকেতটি সেই ডিভাইসের জন্য নয় তখন সেই ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত রিপিটার ক্ষীণ সংকেতকে জোরালো করে তবে পরের কম্পিউটারে পাঠায়। অন্যান্য টোপোলজির তুলনায় রিং টোপোলজি স্থাপন করা অনেক সহজ। যেহেতু প্রত্যেকটি ডিভাইস তার পাশের ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত তাই এই ধরনের নেটওয়ার্কে কিছু পরিবর্তন করতে হলে কেবলমাত্র দুটি কানেকশনের পরিবর্তন করতে হয়। রিং টোপোলজির অসুবিধা হল যে কোনো একটি কম্পিউটার খারাপ হলে পুরো নেটওয়ার্কই বিকল হয়ে পরে।

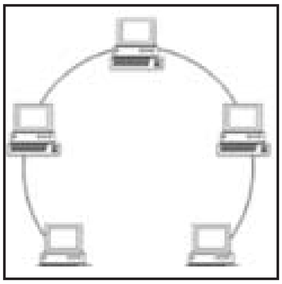

চিত্র ২.১৩: রিং টোপোলজি

২.৬.৩.৪ মেশ টোপোলজি (Mesh Topology)

মেশ টোপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার অন্য সবকটি কম্পিউটারের সঙ্গে তারের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে যুক্ত থাকে। ডাটা আদান প্রদানের জন্য মেশ টোপোলজি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কোনো কম্পিউটার থেকে যে কম্পিউটারে ডাটা পাঠাতে হবে ডাটা সরাসরি সেই কম্পিউটারে যেতে পারে বা অন্য কম্পিউটারের মাধ্যমেও সেই কম্পিউটারে যেতে পারে। এখানে সুবিধা হল, একটি কম্পিউটারের সঙ্গে আর একটি কম্পিউটার যেহেতু সম্ভাব্য সমস্ত পথে তারের মাধ্যমে যুক্ত থাকে, তাই কোনো একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও অন্য পথে ডাটা সঠিক অ্যাড্রেসে পৌঁছেতে পারে। এই ধরনের টোপোলজির মূল অসুবিধা হল এখানে তারের সংখ্যা এবং I/O পোর্টের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। কম্পিউটারের সংখ্যা যত বাড়বে তারের সংখ্যা তার গুণিতকে বৃদ্ধি পাবে। তাই কম্পিউটারের সংখ্যা অনেক বেশি হলে বা কম্পিউটারগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকলে এই ধরনের টোপোলজি তৈরি করা খুব জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের টোপোলজি স্থাপন করা খুবই ব্যয়বহুল।

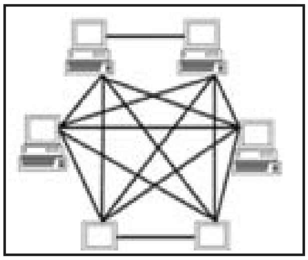

চিত্র ২.১৪: মেশ টোপোলজি

২.৬.৩.৫ ট্রি টোপোলজি (Tree Topology)

নাম থেকেই স্পষ্ট যে ট্রি টোপোলজিতে নোডগুলি কয়েকটি স্তরে অবস্থান করে। প্রথম স্তরে থাকে মূল কম্পিউটার যা সার্ভারের ভূমিকা পালন করে। ক্লায়েন্ট নোডগুলি পরের স্তরে মূল কম্পিউটারের সাথে কেব্‌লের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। আবার ওই নোডগুলির শাখা নোডসমূহ পরবর্তী স্তরে অবস্থান করে যেগুলি কেব্‌লের মাধ্যমে ঐ নোডটির সাথে যুক্ত থাকে। এইভাবে এক একটি স্তরের নোড পরবর্তী স্তরের নোডের ‘পেরেন্ট’ হিসাবে কাজ করে। এই ধরনের টোপোলজিতে মূল কম্পিউটার এবং বিভিন্ন স্তরের নোডের সাথে প্রতিটি নোডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ বর্তমান। এই নেটওয়ার্ককে Hierarchical নেটওয়ার্কও বলা হয়। ট্রি নেটওয়ার্ক টোপোলজি তুলনামূলক বেশি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সহজতর হয় কারণ এই ধরনের নেটওয়ার্ক উপ-শাখায় বিভক্ত। এই ধরনের নেটওয়ার্কে ত্রুটি নির্ধারণ ও সংশোধন সহজতর কারণ কোনো একটি বা একাধিক নোড মূল কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য। এই টোপোলজির প্রধান অসুবিধা হল এখানে মূল কম্পিউটার বিকল হয়ে পড়লে সমগ্র নেটওয়ার্কটি অকেজো হয়ে পড়ে। এই ধরনের নেটওয়ার্কের কাঠামোও তুলনামূলকভাবে জটিল এবং এখানে ডাটা প্রবাহের গতিও কম।

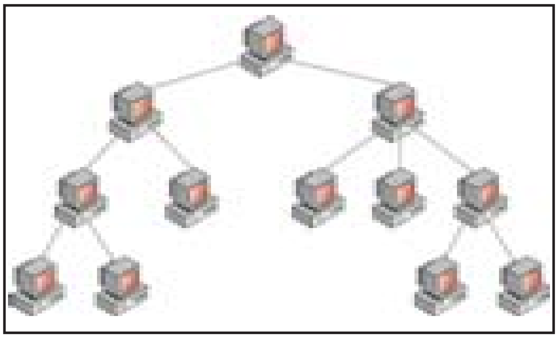

চিত্র ২.১৫: ট্রি টোপোলজি

২.৬.৪ কমপিউটার নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ (Types of Computer Network)

ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রধানতঃ দুই ধরনের হয়। যেমন—

- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network বা LAN) এবং
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network বা WAN)

এছাড়াও রয়েছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network বা MAN) যা আসলে LAN এর বৃহত্তর সংস্করণ।

লোক্যাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network বা LAN)

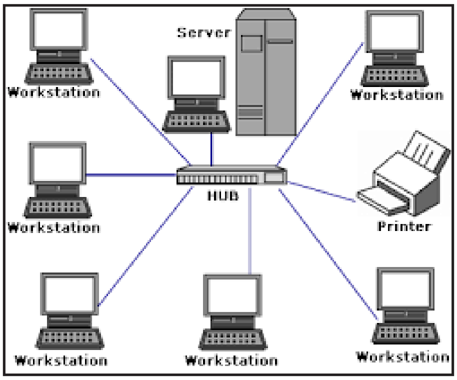

চিত্র ২.১৬ : ল্যান

LAN হল যেকোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মূল ভিত্তি। ভৌগোলিকভাবে কম দূরত্বে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার সিস্টেম (কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাদি যথা প্রিন্টার, মডেম ইত্যাদি) তার বা কেবল্ দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে তথ্য আদান প্রদান করলে যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংগঠিত হয় তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN বলা হয়। LAN এর দূরত্ব একটি বিবেচ্য বিষয় কারণ কম্পিউটারগুলি সাধারণতঃ কেবলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। LAN-এর বিস্তৃতি সাধারণতঃ 10 মিটার থেকে 1 কিলোমিটারের মধ্যে হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সবকটি কম্পিউটারকে বা একটি বহুতল বাড়ির ভিতরের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কম্পিউটারকে, এমনকি পাশাপাশি একাধিক বহুতল বাড়ীর সমস্ত কম্পিউটারকে LAN-এর সাহায্যে যুক্ত করা যায়। সাধারণতঃ কো-এক্সিয়াল কেবল্ (Co-axial cable) LAN-এ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে LAN-এর গতি অর্থাৎ ডাটা প্রেরণ হার 10-100 Mbps (Mega bits per second)। LAN-এ যুক্ত কম্পিউটারগুলি বিভিন্ন নেটওয়ার্ক টোপোলজির মাধ্যমে (Bus, Ring, Star প্রভৃতি) যুক্ত থাকে। LAN-এর প্রধান সুবিধাগুলি হল নেটওয়ার্কের গঠন সরল ও সহজ, তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম এবং ব্যবহারকারী সমস্ত কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাদি (যেমন প্রিন্টার, হার্ডডিস্ক, মডেম ইত্যাদি) ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারে।

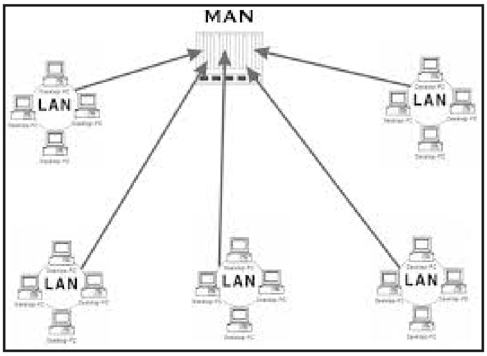

চিত্র ২.১৭ :ম্যান

মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network বা MAN)

MAN হল LAN এর একটি বৃহত্তর সংস্করণ। কোনো বড় শহরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটার সিস্টেমগুলিকে সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয় তাকেই MAN বলা হয়। সুতরাং MAN হল একই শহরে অবস্থিত একাধিক LAN-এর সমন্বয়। এখানেও সাধারণতঃ LAN-এর মত একই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। MAN 10-20 km অবধি বিস্তৃত হতে পারে এবং LAN এর থেকে এর ডাটা transmission এর গতি কম হয়। MAN এ কো-এক্সিয়াল কেবল, ফাইবার অপটিক কেবল ইত্যাদি দ্বারা কম্পিউটারগুলি যুক্ত থাকে। MAN এর গঠন LAN-এর থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল হয় এবং এক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের খরচও বেশি হয়।

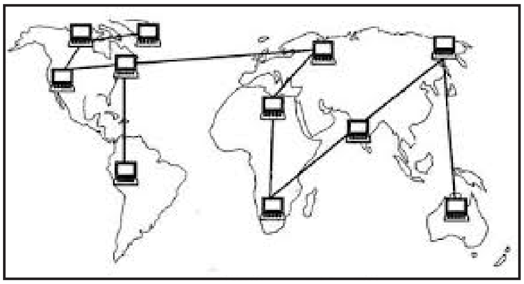
চিত্র ২.১৮ :ওয়ান

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network বা WAN)

এই ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বিস্তৃতক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিকভাবে দূরবর্তীস্থানে অবস্থিত LAN বা MAN একত্রে সংযুক্ত

হয়ে যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার জন্ম দেয় তাই হল WAN। এই ধরনের নেটওয়ার্ক একটি দেশ বা মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই দূরত্ব এখানে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই সংযোগ মাধ্যমটিও আলাদা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে WAN-এর জন্য টেলিফোন লাইন ও মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া সমুদ্রের নীচে পাতা কেবল্ লাইনকেও ব্যবহার করা হয়। WAN এর মাধ্যমেই সারা বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ইন্টারনেট হল WAN-এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। WAN-এ দক্ষতা তথা সুবিধার সাপেক্ষে খরচ নিতান্তই কম।

সারসংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ে কম্পিউটারের মেমোরি, অপারেটিং সিস্টেম এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- কম্পিউটারের মেমোরিতে ডাটা এবং প্রোগ্রামসমূহ সঞ্চিত থাকে। সাধারণত মেমোরি প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি এই দুই প্রকারের হয়। প্রাইমারি মেমোরিই কম্পিউটারের প্রকৃত ব্রেন যা ছাড়া কম্পিউটার সচল হতে পারে না। প্রাইমারি মেমোরির দুটি অংশ— অস্থায়ী মেমোরি বা RAM এবং স্থায়ী মেমোরি বা ROM। কম্পিউটারের সেকেন্ডারি মেমোরিতে প্রচুর তথ্য ও প্রোগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী ভাবে স্টোর করা যায়। আবার এখান থেকে ডাটা মুছেও ফেলা যায় অতি সহজে। হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, CD-ROM, DVD ইত্যাদি হল পরিচিত সেকেন্ডারি মেমোরি। কম্পিউটার মেমোরির ক্ষুদ্রতম একক হল BIT বা Binary Digit।
- কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হল এমন একটি সিস্টেম সফ্টওয়্যার যা কম্পিউটারের কাজকর্মকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অপারেটিং সিস্টেম না থাকলে কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি বা প্রোগ্রাম দিয়ে কোন কাজ করা যায় না। অপারেটিং সিস্টেম হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কার্য সম্পাদনের পরিবেশ তৈরি করে। DOS, WINDOWS এবং LINUX হল তিনটি বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হল এমন একটি সংযোগ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দুই বা তার বেশী কম্পিউটার পরস্পরের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করে এবং রিসোর্স শেয়ার করে। নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলিকে নোড বা ওয়ার্ক স্টেশন বলে এবং সংযোগ মাধ্যমকে বলা হয় কমিউনিকেশন চ্যানেল।
- নেটওয়ার্কের আর্কিটেক্চার অনুযায়ী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দুই প্রকারের — ক্লায়েন্ট–সার্ভার নেটওয়ার্ক এবং পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক।
- টোপোলজি হল যে কোনো নেটওয়ার্কে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ যুক্ত হওয়ার জ্যামিতিক বিন্যাস। পরিচিত নেটওয়ার্ক টোপোলজিগুলি হল বাস টোপোলজি, স্টার টোপোলজি, রিং টোপোলজি, মেশ টোপোলজি এবং ট্রি টোপোলজি।
- নেটওয়ার্কের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তিন ধরনের হয়। এগুলি হল— Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN) এবং Wide Area Network (WAN)। কম দূরত্বে অবস্থিত কম্পিউটারগুলি LAN এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ কোনো বড় শহরের বিভিন্ন স্থানের কম্পিউটারগুলিকে MAN-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। WAN এর বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। WAN এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল Internet।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key words)

Primary Memory, Secondary / Auxiliary Memory, RAM, ROM, Static RAM, Dynamic RAM, PROM, EPROM, Hard Disk, Floppy Disk, CD-ROM, DVD, CD-RW, BIT, Byte, Nibble, Kilo Byte, Mega Byte, Giga Byte, System Software, Application Software, Utility Programs, Operating System, Translator, Interpreter, Machine Language, High Level Language, GUI, DOS, WINDOWS, LINUX, Network, Client-Server Network, Peer-to-Peer Network, Network Topology, LAN, MAN, WAN.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) কম্পিউটার মেমোরি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(২) RAM ও ROM কী?

(৩) ROM কয় প্রকার ও কী কী?

(৪) কম্পিউটারে সেকেন্ডারি মেমোরির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

(৫) RAM-কে অস্থায়ী মেমোরি বলা হয় কেন?

(৬) Booting বলতে কী বোঝায়?

(৭) ছবিসহ একটি হার্ডডিস্কের বর্ণনা করো।

(৮) Cache Memory বলতে কী বোঝায়? এই মেমোরি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(৯) Software ও Hardware বলতে কি বোঝায়?

(১০) Utility Software কী?

(১১) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে?

(১২) অপারেটিং সিস্টেম কী?

(১৩) সিরিয়াল প্রসেসিং ও ব্যাচ প্রসেসিং বলতে কী বোঝায়?

(১৪) অপারেটিং সিস্টেমের কার্যগুলি বর্ণনা করো।

(১৫) কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি লেখ।

(১৬) নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

(১৭) নেটওয়ার্ক টোপোলজি কাকে বলে? বিভিন্ন নেটওয়ার্ক টোপোলজির ছবিসহ বর্ণনা দাও।

(১৮) LAN, MAN এবং WAN এর ছবিসহ বর্ণনা দাও। এদের সুবিধা, অসুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ করো।

(১৯) **পার্থক্য লেখ ঃ**

RAM ও ROM, CD ও DVD, সিস্টেম সফ্টওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার, কম্পাইলার ও ইনটারপ্রিটার, ক্লায়েন্ট-সার্ভার ও পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক, LAN এবং WAN।

(২০) **টীকা লেখ ঃ**

প্রাইমারি মেমোরি, ROM, হার্ড ডিস্ক, CD-ROM, অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার, মাল্টি প্রোগ্রামিং, সেকেন্ডারি স্টোরেজ, Linux, স্টার টোপোলজি, MAN, কম্পুটার ল্যাঙ্গুয়েজ।

(২১) **সম্পূর্ণ নাম লেখ ঃ**

RAM, ROM, EEPROM, UVPROM, POST, SASD, CD-ROM, DRAM, DVD, GUI, LAN, WAN।

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) কম্পিউটার ল্যাবে যে কম্পিউটার ব্যবহার কর তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

(২) কোন ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তোমার কম্পিউটার ল্যাবে বর্তমান? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

(৩) নীচের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ফোল্ডারগুলি WINDOWS-এর Desktop-এ তৈরি করো।

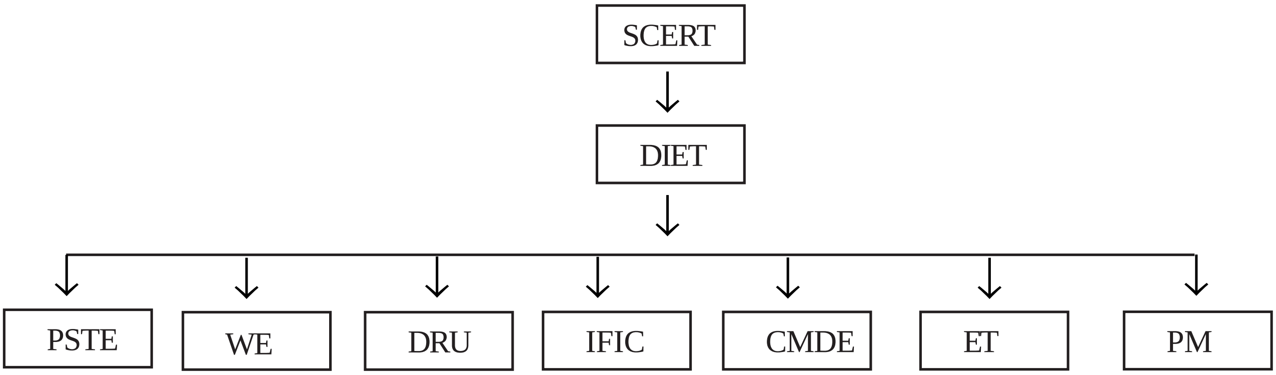

অধ্যায়

৩

ওয়ার্ড প্রসেসিং

৩.১ সূচনা (Introduction)

যে সকল সফ্‌টওয়্যারের মধ্যে লেখা বা টেক্সট এডিটিং (text editing) ও প্রসেসিং (processing) এর যাবতীয় সুবিধা বর্তমান (যেমন কাট্ (cut), কপি (copy), পেস্ট (paste) ইত্যাদি) এবং প্রয়োজনমত টেক্সটকে বিভিন্ন আকারে বা সজ্জায় রূপান্তরিত করা যায়, সেইসব সফটওয়্যারকে ওয়ার্ড প্রসেসিং (word processing) সফটওয়্যার বা ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ (word processing package) বলা হয়। এককথায় বলা যায়, ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের মধ্যে কোনো ডকুমেন্ট (document) বা রিপোর্ট (report) তৈরির জন্য যাবতীয় সুবিধা পাওয়া যায়। বাজারে বিভিন্ন Word Processing Package পাওয়া যায়, তার মধ্যে বহুল প্রচলিত ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজটি হল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা MS-Word, যেটি মাইক্রোসফট অফিস বা MS-Office এর একটি অংশ। MS-Word হল একটি অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার, যেটি ব্যবহার করে কোনো কিছু লেখা (text writing), লেখা ফরম্যাট করা Formating), সেভ (save) করা এবং তা প্রিন্টিং (printing) করে বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি করা যায়।

বাজারে অনেক ধরনের Word Processor আছে, যার মধ্যে জনপ্রিয় Word Processor গুলি হল—Word Star, Word Perfect এবং Microsoft Word।

এই অধ্যায়টি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে।

- ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং ওয়ার্ড প্রসেসর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- কম্পিউটারের মধ্যে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানা যাবে।
- মেইল মার্জ কি এবং কিভাবে তা ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।
- বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি করা, এডিটিং করা, ডকুমেন্ট প্রিন্ট করা এবং তা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাবে।

৩.২ ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General Characteristics of Word Processing)

কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো ডকুমেন্ট তৈরির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম। অন্য কথায় বলা যায়, ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ডকুমেন্ট তৈরি করা যায়। একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল বেসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Basic features), ডেক্সটপ পাবলিশিং বৈশিষ্ট্যসমূহ (Desktop publishing features), ল্যাংগুইজ বৈশিষ্ট্যসমূহ (language features) এবং ওয়েব বৈশিষ্ট্যসমূহ (web features)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বেসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ— ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর এই বৈশিষ্ট্যসমূহের সাহায্যে টেক্সট লেখা ও পরিবর্তন করা যায় খুব সহজেই। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর বেসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সেগুলি হল—

- ডকুমেন্ট সেভ করা পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য।
- বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফরম্যাটে ডকুমেন্ট সেভ করা, যেমন RTF (rich text format), PDF, HTML ইত্যাদি।
- ডকুমেন্টের মধ্যে নতুন টেক্সট ইনসার্ট করা ও টেক্সট মোছা।
- ডকুমেন্টের মধ্যে টেক্সট সার্চ করা ও রিপ্লেস করা।

- টেক্সট ডকুমেন্টের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা ও কপি করা।
- ওয়ার্ড wrap around করা, অর্থাৎ enter বা return প্রেস করা ছাড়াই কোনো ডকুমেন্টের একটি লাইনের শেষে কারসার অটোমেটিকভাবে নীচের লাইনে শিফট করা।

ডেক্সটপ পাবলিশিং বৈশিষ্ট্যসমূহ— ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর এই সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে ডকুমেন্ট, রিপোর্ট, নিউজলেটার, হ্যান্ডআউট খুব সুন্দরভাবে সাজানো যায়। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর এই বৈশিষ্ট্যগুলি ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা প্রদান করে সেইগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

- ডকুমেন্টের মধ্যে অ্যালাইনমেন্ট (Alignment) ও জাস্‌টিফাই (Justify) করার সুবিধা প্রদান করে।
- কোনো ডকুমেন্টের টেক্সটের বিভিন্ন ফন্ট (fonts), স্টাইল, কালার, মার্জিন, লাইন স্পেসিং (line spacing) ইত্যাদি ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে।
- ডকুমেন্টের মধ্যে হেডার (Header), ফুটার (Footer) এবং পেজ নাম্বার লেখার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।
- কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে ছবি, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি ইনসার্ট করার প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে।
- যথোপযুক্ত গ্রামার ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা প্রদান করে সেইগুলি সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা হয়েছে।
  - ➢ কোনো ডকুমেন্টের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বানান চেক ও সঠিক করতে সাহায্য করে।
  - ➢ ডকুমেন্টের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অলটারনেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
  - ➢ ডকুমেন্ট লেখার ক্ষেত্রে সঠিক ভাষা ও যথোপযুক্ত গ্রামার ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

ওয়েব বৈশিষ্ট্যসমূহ— ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করা যায় এবং ডকুমেন্টের মধ্যে ওয়েব রিসোর্স ব্যবহার করা যায়। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা প্রদান করে সেগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

- কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে লাইভ URL ইনসার্ট করতে সাহায্য করে যাতে ডকুমেন্টটি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করা যায় এবং ডকুমেন্টের মধ্যে ওয়েব রিসোর্স ব্যবহার করা যায়।
- ওয়েব পেজ তৈরি করতে সাহায্য করে।

৩.৩ MS-Word এ কাজ করা (Working with MS-Word)

MS-Word ওপেন করে কোনো ডকুমেন্ট বানাতে হলে নীচের পর্যায়গুলি অনুসরণ করতে হবে।

- উইন্ডোজে স্টার্ট বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- যে মেনু আসবে তার মধ্যে থেকে প্রোগ্রামস (Programs) সিলেক্ট করতে হবে।

চিত্র ৩.১ : ওপেনিং, MS-Word

- যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের তালিকা আসবে তার মধ্যে থেকে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডের উপর মাউস পয়েন্টার এনে একবার ক্লিক করলে MS-Word র উইন্ডো বা পেজ খুলে যাবে। এখন এই পেজে প্রয়োজনমত ডকুমেন্ট তৈরি করা যায়। তবে MS-Word ব্যবহার করে কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে MS-Word র উইন্ডো সম্পর্কে পরিচিতি দরকার। নীচে এই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.৩.১ Word Window পরিচিতি (Knowing About Word Window)

ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার আগে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডের স্ক্রিনটাকে সঠিকভাবে জেনে নেওয়া দরকার। এই পেজে অবস্থিত বিষয়গুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

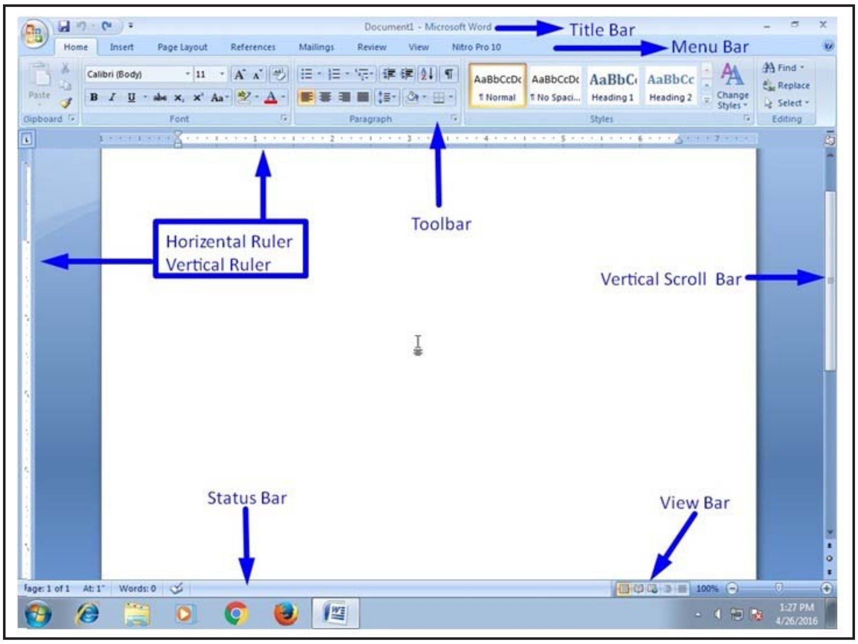

চিত্র ৩.২ : মাইক্রোসফট্ ওয়ার্ড উইন্ডো

টাইটেল বার (Title Bar) : কোনো ডকুমেন্টের নাম এবং তার সাথে Microsoft word কথাটি টাইটেল বারে প্রদর্শিত হয়।

মেনুবার (Menu Bar) : মেনুবারের সাহায্যে বিভিন্ন মেনু খুলে বিভিন্ন কমান্ড ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা যায়।

টুলবার (Tool Bar) : প্রয়োজন অনুযায়ী টুলবারের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণিভুক্ত কমান্ড ব্যবহার করা যায়।

ভার্টিকাল স্ক্রল বার (Vertical Scroll Bar) : এর সাহায্য কোনো ডকুমেন্টের উপরের বা নীচের দিকে মুভ (move) করা যায়।

হরাইজন্টাল স্ক্রল বার (Horizontal Scroll Bar) : এর সাহায্যে কোনো ডকুমেন্টের বাম দিকে বা ডান দিকে মুভ করা যায়।

স্প্লিট বার (Split Bar) : এর সাহায্যে ওয়ার্ডের উইন্ডোকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করা যায়—যাতে কোনো ডকুমেন্টের ভিন্ন অংশগুলি একই সাথে দেখা যায়।

স্ট্যাটাস বার (Status Bar) : স্ট্যাটাস বার ডকুমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করে। যেমন—কোনো ডকুমেন্টের মোট পেজ সংখ্যা, বর্তমান পেজ নম্বর, কার্সর পজিশন ইত্যাদি।

নেক্সট পেজ ও প্রিভিয়াস পেজ (Next Page & Previous Page) : এইগুলিতে ক্লিক করে কোনো ডকুমেন্টের যথাক্রমে পরবর্তী ও পূর্ববর্তী পেজে মুভ করা যায়।

ভিউ বোতাম বা বাটন (View Button) : এটি কোনো ডকুমেন্টকে বিভিন্ন রূপে (যেমন-Normal, Web Layout, Print Layout, Outline ইত্যাদি) উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

৩.৩.২ নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করা (Creating New Document)

MS-Word ব্যবহার করে কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করতে হলে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) File মেনুতে গিয়ে নিউ (New) -তে ক্লিক করতে হবে।

(খ) নীচের চিত্রের মতো Dialog Box আসবে এবং Blank Document আইকনটিতে ক্লিক করতে হবে।

(গ) সবশেষে OK লেখা বোতামটিতে ক্লিক করলে একটি নতুন ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে। এবার বিষয়বস্তু (text) টাইপ করতে হবে।

File → New → Open a dialog box → blank document

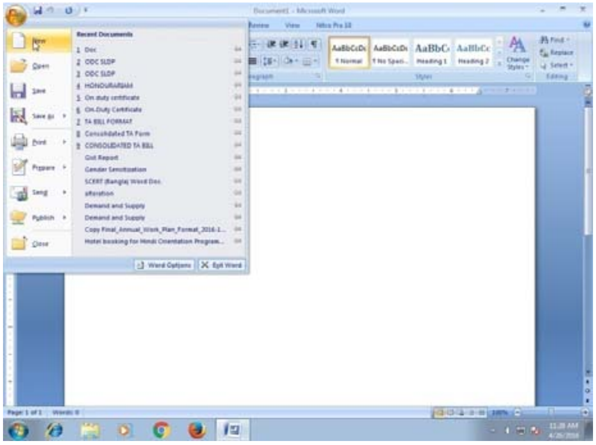

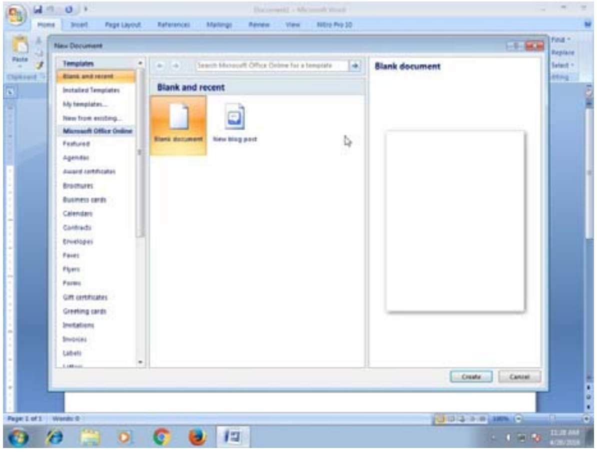

চিত্র ৩.৩ : নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করা

৩.৩.৩ ডকুমেন্ট সেভ করা (Saving a Document)

নতুন ডকুমেন্ট বা ফাইলের কাজ শেষ হওয়ার পর অবশ্যই সেভ (save) করা প্রয়োজন। অন্যথায় নতুন ডকুমেন্ট কম্পিউটার বন্ধ হওয়া মাত্রই মুছে যাবে। এক্ষেত্রে সেভ (save) এবং সেভ এস (Save As) উভয় অপশনই মূলত কোনো ডকুমেন্ট সেভ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। Save দ্বারা কোনো ডকুমেন্টকে শুধুই কম্পিউটারের কোনো নির্দিষ্ট একটি জায়গায় সেভ করা যায়। অন্যদিকে Save As দ্বারা কোনো ডকুমেন্টকে কম্পিউটারের বিভিন্ন লোকেশনে (location) (যেমন-Desktop, C Drive, D Drive ইত্যাদি) এ সেভ করা যায়। প্রথমে ফাইল অপসনে কারসর ক্লিক করে Save বা Save As এর dialog box সিলেক্ট করে ওই ফাইল বা ডকুমেন্টটির নাম দিয়ে save করতে হবে। কী বোর্ডের সাহায্যেও ফাইল বা ডকুমেন্ট save করা যায়। এক্ষেত্রে Ctrl+S এবং F_{12} প্রেস করলে যথাক্রমে Save ও Save As এর ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে।

নিম্নে ডকুমেন্ট সেভ করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

File → Save/Save As → Chooses the location/Default location
↓
Save ← Put a file or Document name

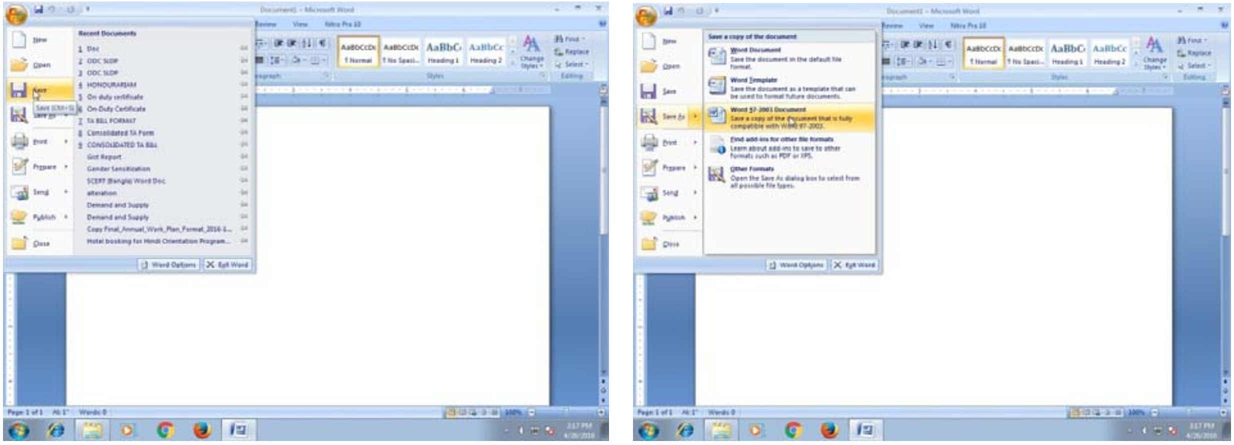

চিত্র ৩.৪ : ডকুমেন্ট সেভিং

MS-Word এ কোনো ডকুমেন্ট সেভ করলে ডকুমেন্টটির বা ফাইলটির Extention হবে doc বা docx।

৩.৩.৪ ডকুমেন্ট খোলা (Opening a Document)

কোনো Document বা ফাইল পড়তে হলে বা Edit করতে হলে তা প্রথমে ওপেন করতে হবে। File অপসনে গিয়ে ওপেন সিলেক্ট করে নির্দিষ্ট location এ, নির্দিষ্ট নামে ক্লিক করে file বা ডকুমেন্ট ওপেন করা হয়। কী-বোর্ডের সাহায্যে Ctrl+O প্রেস করলেও Document ওপেন হয়ে যাবে। নিম্নে ডকুমেন্ট ওপেন করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

File → Open → Select the drive name (location)
↓
Select the file name which we want to open → Open

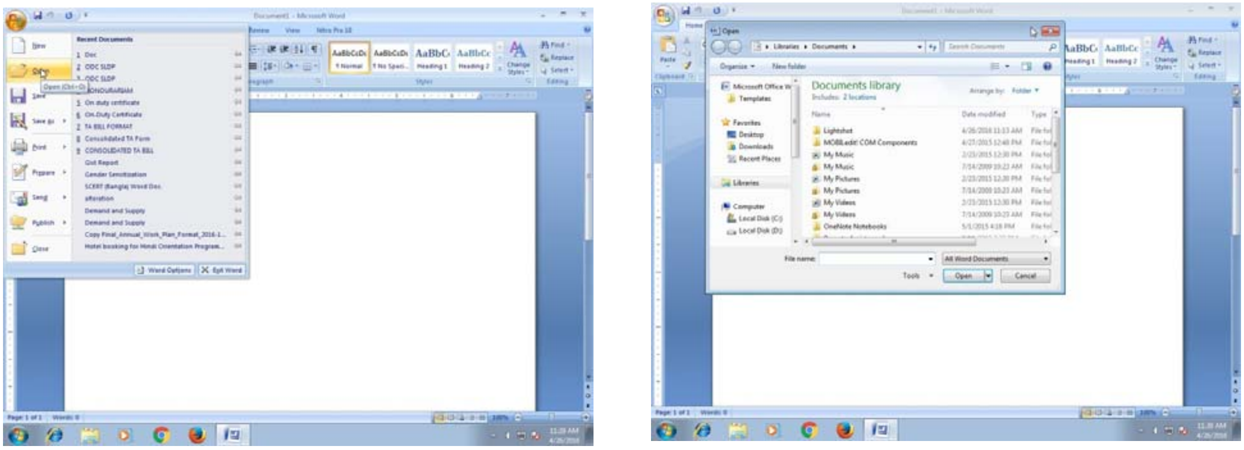

চিত্র ৩.৫ : ডকুমেন্ট ওপেন করা

৩.৩.৫ ডকুমেন্ট এডিট করা (Editing a Document)

কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করার পর যদি কিছু পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে ওই ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা যেতে পারে অথবা বিষয়বস্তু থেকে কিছু অংশ মুছে (Delete) ফেলা যেতে পারে। এইভাবে নতুন টেক্সট সংযোজন (insertion) বা বিয়োজন (deletion) করে ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করা যেতে পারে। এছাড়া ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর কিছু অংশ রিপ্লেসমেন্ট (Replacement) করে নতুন কোনো টেক্সট সংযোজন করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াগুলিকে ডকুমেন্ট এডিটিং (editing) বলা হয়। MS-Word এ কোনো ডকুমেন্ট এডিটিং-র বিভিন্ন উপায়গুলি (options) নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

কপি করা (Copying) — কোনো ফাইল বা ডকুমেন্টের কিছু অংশ একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় কপি করা সম্ভব। যে অংশটি কপি করতে হবে সেই অংশটি সিলেক্ট করে এডিটিং বারের (editing bar) সাহায্যে অথবা কী বোর্ডের Ctrl+C বাটন প্রেস করে কপি করা যায়। এইবার সিলেক্টেড অংশটি ডকুমেন্টের যে জায়গায় কপি করতে হবে সেই জায়গায় কারসার নিয়ে এডিটিং বার অথবা কী বোর্ড থেকে Ctrl + V প্রেস করলে সিলেক্টড অংশটি ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট জায়গায় কপি হয়ে যাবে। সিলেক্ট করা অংশটি অন্য ডকুমেন্টের মধ্যেও কপি করা সম্ভব।

পেস্ট করা (Pasting)— কোনো ফাইল বা ডকুমেন্টের কিছু অংশ কাট বা কপি করে ওই ডকুমেন্টের অন্য জায়গায় (location) বা অন্য ডকুমেন্টে পেস্ট করা সম্ভব। এই কাজটি এডিটিং বারের সাহায্যে অথবা কী বোর্ডের (Crtl+V) বাটনটি প্রেস করে করা যায়।

মুছে ফেলা (Deleting)— কোনো ডকুমেন্টের যে অংশটি দরকার নেই তা সিলেক্ট করে ডিলিট (Delete) বা ক্লীয়ার (clear) করা সম্ভব। এই কাজটি কী বোর্ড থেকে delete key বা back space key প্রেস করে করা যায়।

সাবস্ক্রিপ্ট ও সুপারস্ক্রিপ্ট (Subscript and Superscript)

(Text) লেখার মধ্যে অনেক সময় একটি অক্ষরের নীচে বা ওপরে ছোটো করে অন্য অক্ষর বা নম্বর লিখতে হয়। যে অক্ষরটি নীচে থাকে তাকে সাবস্ক্রিপ্ট এবং যে অক্ষরটি উপরে থাকে তাকে সুপারস্ক্রিপ্ট বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ a_2 ও a^3 র মধ্যে 2 হল সাবস্ক্রিপ্ট এবং 3 হল সুপারস্ক্রিপ্ট। কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে সাবস্ক্রিপ্ট বা সুপারস্ক্রিপ্ট লিখতে হলে পেজের Home Menu তে প্রথম ক্লিক করে তারপরে Font এ ক্লিক করে subscript X_2 বা superscript X^2 ক্লিক করতে হবে। তারপর OK ক্লিক করে ডকুমেন্টে এসে 2 type করতে হবে। এরপর Home Menu তে Font অপসনে এসে Subscript বা Superscript নির্দেশ (✓) উঠিয়ে দিতে হবে। এছাড়া কী-বোর্ডে সাবস্ক্রিপ্টের জন্য Ctrl + = এবং সুপারস্ক্রিপ্টের জন্য Ctrl+Shift+= প্রেস করলেও তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপারস্ক্রিপ্ট লেখা সম্ভব।

কেস পরিবর্তন করা (Changing Case)

কোনো লাইনের মধ্যে শব্দগুলি ছোটো হাতের অক্ষর বা বড়ো হাতের অক্ষরে পরিবর্তন করাকে বলা হয় কেস পরিবর্তন (Changing Case)। এগুলি করতে হলে প্রথমে লাইনের শব্দটিকে বা লাইনটিকে সিলেক্ট করে Home tab এ change case সিলেক্ট করে change case dialog বক্সে ক্লিক করতে হবে। এছাড়া কেস পরিবর্তনের জন্য শর্টকার্ট হিসেবে shift+F_3 প্রেস করেও করা যায়।

Font, Style ও Size এর পরিবর্তন (Changing of Font, Style and Size)

কোনো ডকুমেন্টে font, font style বা size পরিবর্তন করার দরকার হলে প্রথমে (text) টেকস্ট সিলেক্ট করে Home tab এ Font Part এ ক্লিক করে Font dialog box অপসনে গিয়ে পছন্দমতো ফন্ট Select করে Ok ক্লিক করতে হবে। font dialog box খোলার শর্টকার্ট কী হল Ctrl+D।

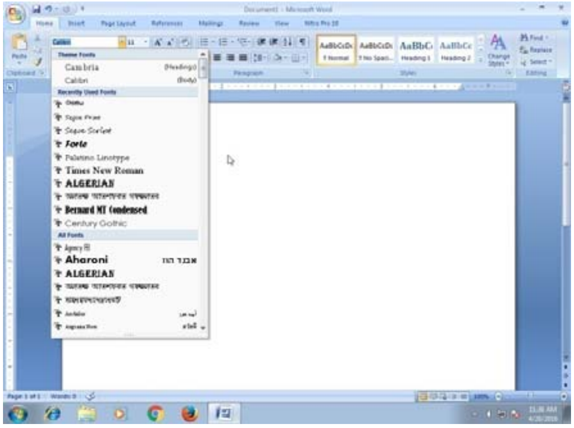

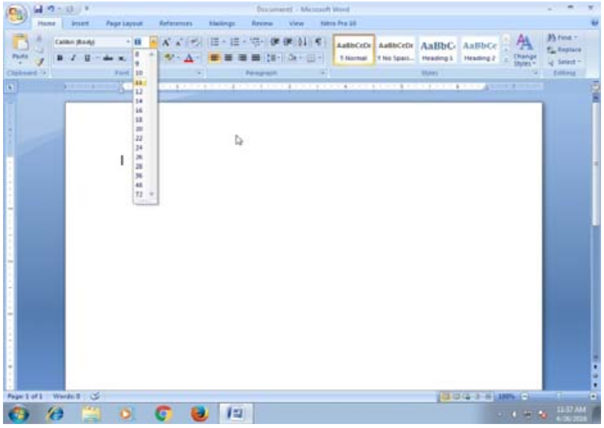

চিত্র ৩.৬ : Font, Style ও Size পরিবর্তন করা

বানান ও ব্যাকরণ (Spelling and Grammar)

অনেক সময় ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর মধ্যে শব্দের বানানের ভুল বা ব্যাকরণগত ভুল থাকতে পারে। MS-Word-এ এই ধরনের ভুল ধরা এবং ঠিক করে দেওয়ার অপসন আছে। এক্ষেত্রে শব্দের বানান ভুল থাকলে ওই শব্দের নীচে লাল দাগ এবং ব্যাকরণ জনিত ভুল থাকলে তার নীচে সবুজ দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লাল দাগের ওই শব্দটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে গিয়ে মাউসের right ক্লিক করলে একটি Window খুলে যাবে। এই উইন্ডোতে ওই বানানের কাছাকাছি অনেকগুলি শব্দ থাকবে এবং user যে শব্দটি পছন্দ করবেন সেটি ক্লিক করলেই ওই শব্দটি ডকুমেন্টে ইনসার্ট হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকগুলি শব্দ কম্পিউটারের Dictionary তে না থাকার কারণে লাল দাগ দেখতে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে Ignore বা Ignore All এ ক্লিক করলে লাল দাগ চলে যাবে।

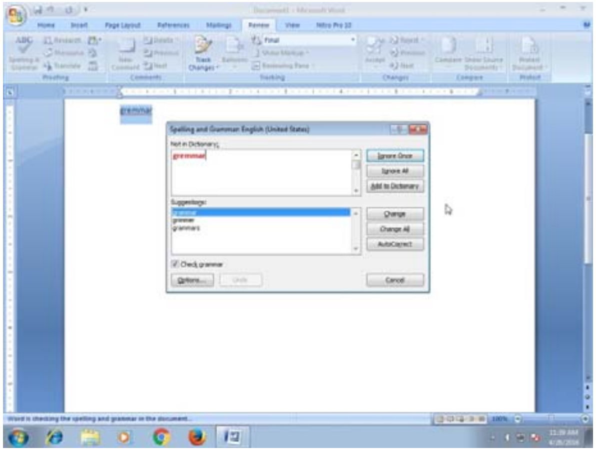

চিত্র ৩.৭ : বানান ও ব্যাকরণ ঠিক করা

ক্লিপ আর্ট (Clip Art)

কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে ক্লিক আর্ট থেকে কোনো ছবি ইনসার্ট করার প্রয়োজন হলে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(১) যে ডকুমেন্টে ক্লিপ আর্ট থেকে ছবি ইনসার্ট করতে হবে, প্রথমে সেটিকে ওপেন করতে হবে।

(২) ডকুমেন্টের যে জায়গায় ক্লিপ আর্ট বসবে সেখানে মাউসের পয়েন্টার রাখতে হবে।

(৩) ইনসার্ট ট্যাবের Illustration কমান্ডগ্রুপের ক্লিপ আর্ট বোতামে ক্লিক করতে হবে।

(৪) স্ক্রিনে ক্লিপ আর্ট টাস্ক পেন উইন্ডো দেখা যাবে।

(৫) টাস্ক পেনের Search for অপসনে যে টাইপের ক্লিপ আর্ট বা গ্রাফিক্স প্রয়োজন সেই শব্দটি টাইপ করে Go বাটনে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় গ্রাফিক্স খুঁজে বের করতে হবে।

(৬) এবার পছন্দের ছবি বা গ্রাফিক্সের উপর ক্লিক করলে ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক আর্টটি ইনসার্ট হয়ে যাবে।

সিম্বল (Symbol)

অনেক সময় ডকুমেন্টের মধ্যে বিশেষ কোন অক্ষর বা সিম্বল বা চিহ্নের প্রয়োজন হয় যা সাধারণত কী-বোর্ডে থাকে না। MS-Word এ এই ধরনের বিভিন্ন চিহ্ন ইনসার্ট করার সুবিধা আছে। এই চিহ্নগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে ইনসার্ট করা যায়।

ডকুমেন্টের যেখানে চিহ্ন আনা দরকার সেখানে কারসারকে রেখে ক্লিক করে ইনসার্ট করতে হবে। তারপর ক্লোজ (Close) বাটনে ক্লিক করলে উইন্ডোটি বন্ধ হয়ে যাবে।

Insert → Symbol → Select the Symbol → Insert

ওয়ার্ড আর্ট (Word Art)

Drawing টুলের Insert Word Art-এর সাহায্য নিয়ে কোনো শব্দ বা লেখাকে বিভিন্ন Style এ লেখা যায়। এই কাজটি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায়।

- Insert ট্যাবের Text কমান্ডগুলোর মধ্যে Word Art বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- Window স্ক্রিনে Word Art এর বিভিন্ন Style দেখা যাবে। সেখান থেকে পছন্দমতো Style বেছে নিতে হবে।
- Window স্ক্রিনে Edit Word Art এর Text বক্স দেখা যাবে।
- Text বক্সে প্রয়োজনীয় text টাইপ করতে হবে এবং পছন্দমতো font ও font-এর size সিলেক্ট করে নেওয়া যেতে পারে।
- প্রয়োজনে text টিকে Bold বা Italic Style এও চেঞ্জ (change) করা যেতে পারে।
- শেষে Ok বাটনে ক্লিক করতে হবে।

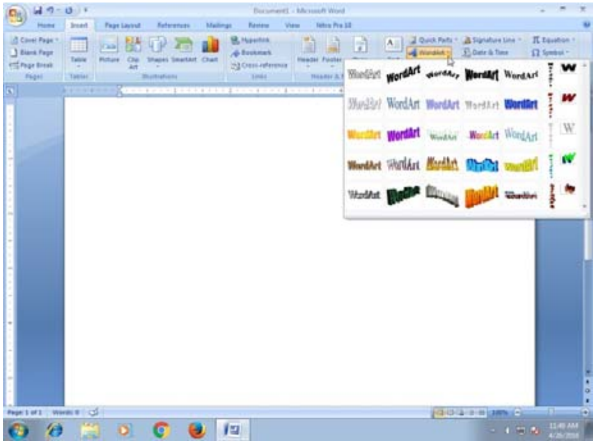

চিত্র ৩.৮ : ওয়ার্ড আর্ট

৩.৪ মেইল মার্জ (Mail Merge)

একই ডকুমেন্ট বা চিঠি বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠাতে হলে চিঠির বিষয়বস্তু বা লেখা একটি Main Document হিসেবে এবং সমস্ত ঠিকানাগুলি অন্য একটি ডকুমেন্ট হিসাবে (Data Source) লিখে, Merge অপশনের সাহায্যে এই দুটি ডকুমেন্টকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়াই Mail Merge নামে পরিচিত।

সমগ্র মেইল মার্জ প্রক্রিয়াটি মূলত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা—

- মেইন ডকুমেন্ট তৈরি (Set up main document) করা
- ডাটা সোর্স তৈরি (Create data source) করা
- মেইন ডকুমেন্টের সাথে ডাটা সোর্স সংযোগ করা বা মার্জ করা (Merging the main document with the data source)।

সমগ্র প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে মেল মার্জ শুরু করার আগে Mail Merge টাস্ক ওপেন করতে হবে এবং এরপর Start Mail Merge বাটনে ক্লিক করে step by step mail merge অপশনে ক্লিক করতে হবে।

মেইন ডকুমেন্ট তৈরি করা (Set up Main Document)

(ক) Mailings রিবনে ক্লিক করে Start mail merge কমান্ড গ্রুপের Start mail merge বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং প্রদর্শিত তালিকার Letter-অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।

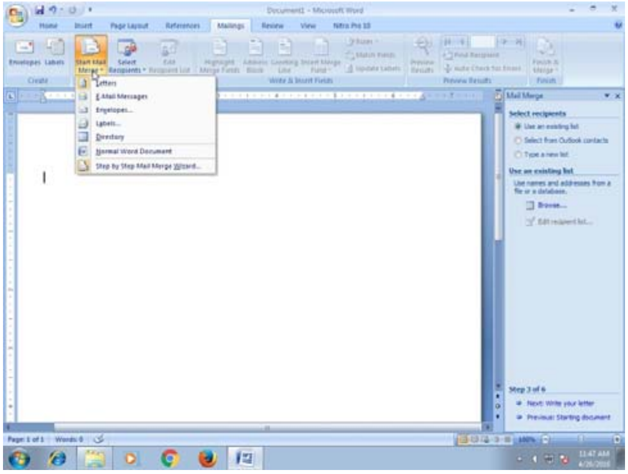

চিত্র ৩.৯ : মেন ডকুমেন্ট তৈরী করা

(খ) এরপর নীচে প্রদর্শিত চিঠির বয়ানটি টাইপ করতে হবে। (নমুনা দেখানো হয়েছে)

To,

Dear x,

Cordially invited to attend my birthday celebration party which is to be held on 20th August 2018 Tuesday in my own house.

I wish that you must come to my house in Salt Lake at 8.00 p.m. onwards.

Your loving friend

y

ডেটা সোর্স তৈরি করা (Creating Data Source)

ডেটা সোর্স তৈরি করার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) Select Recipients বাটনে ক্লিক করে Type A New List-এ পুনরায় ক্লিক করতে হবে।

(খ) New Address List ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। এই ডায়ালগ বক্সে Title, First Name, Last Name ইত্যাদি ফিল্ডের নামগুলি আলাদা আলাদা কলামে থাকবে। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলি রেখে অতিরিক্ত Field-গুলি মোছার জন্য Customize Columns বাটনে ক্লিক করলে Customize Address List ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে।

(গ) অতিরিক্ত Field-গুলি মোছার জন্য ঐ Field-গুলি সিলেক্ট করে Delete বাটনে ক্লিক করতে হবে। যদি কোনো নতুন ফিল্ড যুক্ত করতে হয় তবে Customize Address List ডায়ালগ বক্স-এর Add বাটনে ক্লিক করতে হবে। একটি Add Field ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। Field-এর নাম লিখে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(ঘ) এরপর Customize Address List ডায়ালগ বক্সের OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(ঙ) New Address List ডায়ালগ বক্সটি পুনরায় প্রদর্শিত হবে। এখানে সঠিক তথ্য দ্বারা নির্দিষ্ট Field-গুলি পূরণ করতে হবে। প্রথম প্রাপকের সমস্ত তথ্যগুলি লেখা হয়ে গেলে New Entry বাটনে ক্লিক করে পরবর্তী প্রাপকের তথ্য এন্ট্রি করতে হবে। এইভাবে সমস্ত Record এন্ট্রি হলে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(চ) এরপর Save Address List ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। এখানে যে সকল প্রাপকের Record-গুলি টাইপ করা হয়েছে সেই Record-গুলি একটি ফাইল হিসেবে স্টোর হবে। এবার এই ডায়ালগ বক্সের টেক্সট বক্সে পছন্দমত ফাইলের নাম লিখে Save বাটনে ক্লিক করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রাপকদের রেকর্ড সমন্বিত ডেটা সোর্ট ফাইলটির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে .mdb এক্সটেনশন যুক্ত হবে।

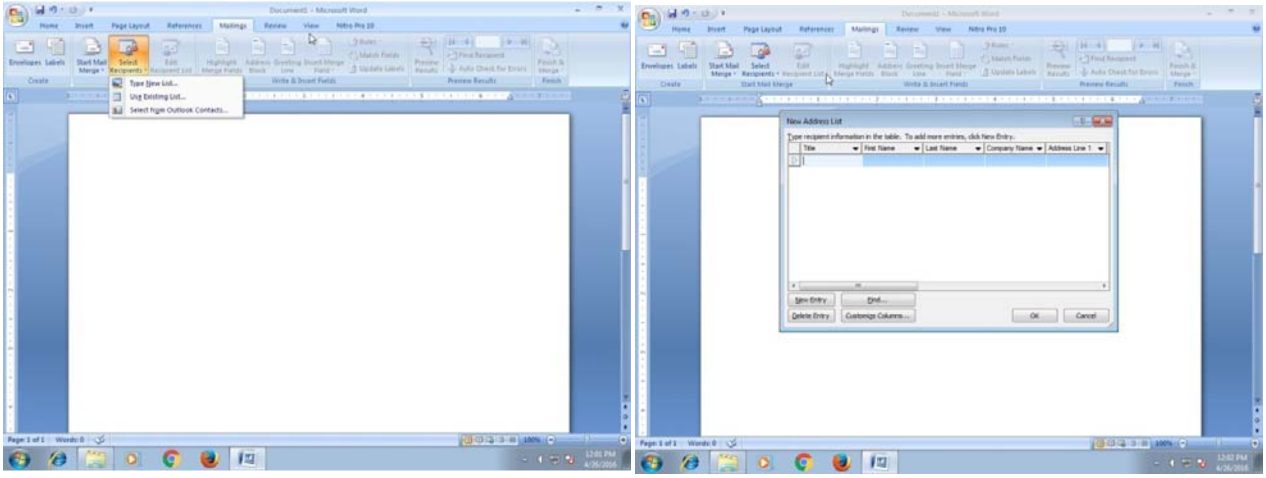

চিত্র ৩.১০ : ডেটা সোর্স তৈরি করা

মেইন ডকুমেন্ট ও ডাটা সোর্স মার্জ করা (Merging Main Document and Data Source)

এই পর্যায়ে মেইন ডকুমেন্টের সাথে ডাটা সোর্স মার্জ করলে মেল মার্জ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে।

(ক) প্রথমে মেইন ডকুমেন্ট ওপেন করে তারপর কারসার Main Document-এর To লেখার নীচে রেখে Insert Merge Field বাটনে ক্লিক করে প্রাপ্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন Field-গুলি (যেমন-First Name, Address Line_1 ইত্যাদি) পরপর মেন ডকুমেন্টে যুক্ত করতে হবে।

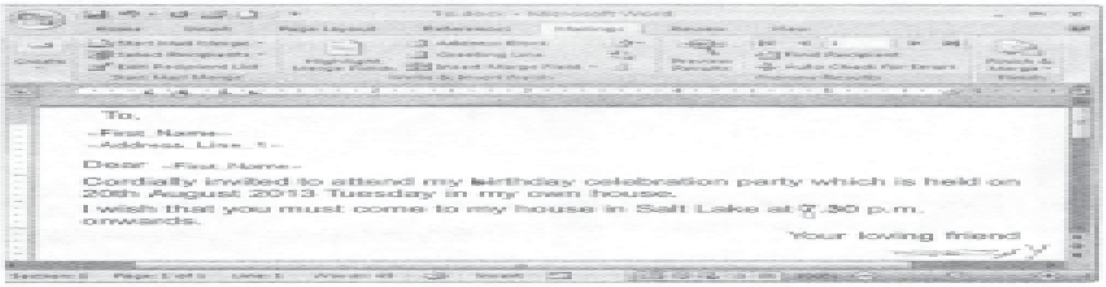

চিত্র ৩.১১ : মেইল মার্জ

(খ) এরপর Preview Results বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) Next Record এর অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করলে প্রত্যেকটি recipients-এর (প্রাপকের) রেকর্ডগুলি দেখতে পাওয়া যাবে।

(ঘ) এরপর Finish কমান্ড গ্রুপের Finish & Merge বাটনে ক্লিক করে প্রাপ্ত তালিকায় Print Documents-এ ক্লিক করলে Merge to Printer ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। এই ডায়ালগ বক্সের OK বাটনে ক্লিক করে ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে হবে।

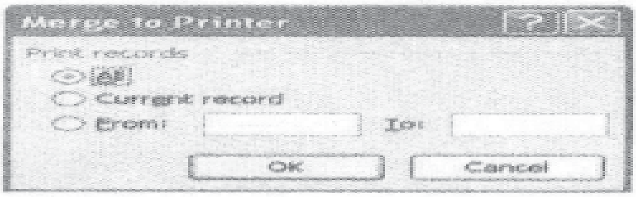

চিত্র ৩.১২ : প্রিন্টিং মার্জ ডকুমেন্ট

৩.৫ পেজ সেট আপ (Page Set up)

Page Layout অপশনটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-মার্জিন (Margins), ভার্টিকাল অ্যালাইমেন্ট (Vertical Alignment), পেজ এবং প্যারাগ্রাফ ব্রেক (Page and Paragraph Break), সেকসান ব্রেক (Section Break), পেজ নাম্বার (Page Number), হেডার ও ফুটার (Header & Footer), পেপার সাইজ (Paper Size) ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

(ক) মার্জিন (Margins)-Page Setup কমান্ড গ্রুপের মধ্যে অবস্থিত Page Layout Tab-এর থেকে একটি নির্দিষ্ট Page-এর ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ পেজটিতে মার্জিন সেট আপ করা যায়। এছাড়াও Page-Setup ডায়ালগ বক্স থেকে ডকুমেন্ট ফাইলের Margin-এর বিভিন্ন ধর্মগুলি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। Page Setup ডায়ালগ বক্সের মধ্যে অবস্থিত Margin Tab Property Sheet টির মধ্যে যে সকল অপশনগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি হলো Top বা উপরের মার্জিন নির্ধারণ করা, Bottom বা নীচের মার্জিন নির্ধারণ করা, Left বা বামদিকের মার্জিন নির্ধারণ করা এবং Right-বা ডানদিকের মার্জিন নির্ধারণ করা। এছাড়া মার্জিন ও অতিরিক্ত Space দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় Gutter এবং এর পজিসন নির্ধারণ করা হয় খাতা বা বইয়ের বাইন্ডিং করার জন্য।

(খ) অরিয়েন্টশান (Orientation)-যে কোনো পেজকে দুটি ভিন্ন Orientation-এ সেট করা যায়। যেমন পোর্টের্ট (Portrait) এবং ল্যান্ডস্কেপ (Landscape)। Portrait ব্যবহার করা হয় লম্বালম্বিভাবে পেজটিকে সেটিং বা সাজানোর জন্য এবং Landscape ব্যবহার করা হয় অনুভূমিক রেখা বরাবর পেজটিকে সাজানোর জন্য।

(গ) মাল্টিপেল পেজেস (Multiple Pages)-Margin Tab Sheet-এ Orientation অপশনের পর Multiple Pages List Box টি থাকে যার দ্বারা একাধিক পেজে ব্যবহারকারী ইচ্ছে অনুযায়ী একই Page setup property ব্যবহার করা যায়।

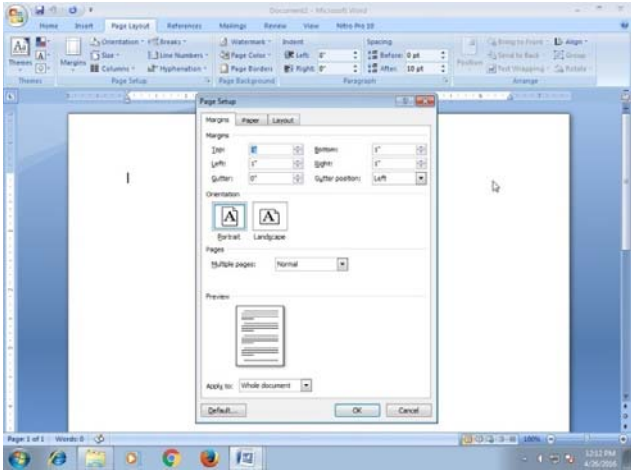

চিত্র ৩.১৩ : পেজ সেট আপ

(ঘ) পেপার সাইজ (Paper Size)- একটি নির্দিষ্ট পেপারের আকার আকৃতি পরিবর্তন করতে হলে, এর মধ্যে টাইপ করা টেক্সট বা লেখাগুলিকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে। Page Setup ডায়ালগ বক্সের পেপার ট্যাব Property Sheet এ ক্লিক করলে যে সকল অপশনগুলিকে পাওয়া যায় সেগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

- **Paper Size List Box**-এর সাহায্যে পেপারের সাইজ বা আকৃতিকে নির্ধারণ করা হয়। যেমন, A1, A2, A4, Letter Size, Legal Size, A3, A5, Custom ইত্যাদি।
- **Width** - এই অংশটি ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট পেজ বা পেপারটি কত চওড়া হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

● **Height** - এই অংশটি ব্যবহৃত হয় কোনো নির্দিষ্ট পেজের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করার জন্য।

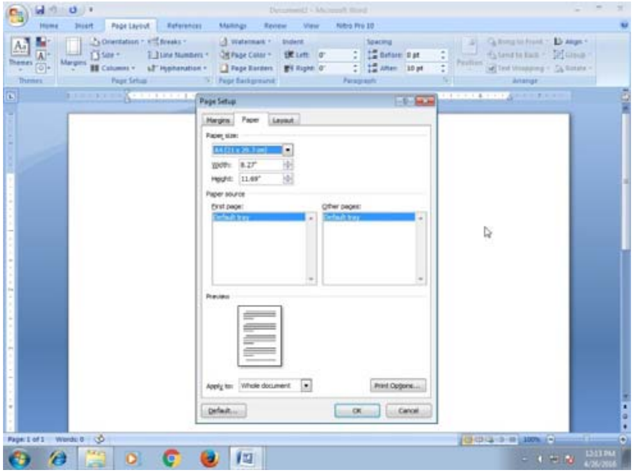

চিত্র ৩.১৪ : পেজ সেটআপ

● **Paper Source** - নির্দিষ্ট এক বা একাধিক পেপার বা পেজকে প্রিন্ট বা ছাপানোর জন্য Page Setup ডায়ালগ বক্সে অবস্থিত পেপার সাইজ ট্যাব প্রপারটি শীটের মধ্যে Paper Source অপশনটি দুটি ভিন্ন Scroll Box দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। এই অপশন দুটি হল First Page Scroll Box এবং Other Pages Scroll Box.

(ঙ) পেজ ও প্যারাগ্রাফ ব্রেক (Page and Paragraph Break)-ব্যবহারকারীব ইচ্ছানুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পেজের-এর নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফের পর থেকে Break দিয়ে নতুন পেজ শুরু করতে হলে Insert ট্যাবের পেজ্ কমান্ডগ্রুপের মধ্যে অবস্থিত Page Break অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। যে অংশ থেকে Page Break করতে হবে ব্যবহারকারী ঐ নির্দিষ্ট পেজ-এর নির্দিষ্ট অংশে কারসার রাখলে সেই অংশ থেকে পেজটি দ্বি-বিভক্ত হয়ে নতুন পেজ শুরু হবে।

(চ) হেডার ও ফুটার (Header and Footer) - Insert ট্যাবের মধ্যে অবস্থিত Header and Footer কমান্ড গ্রুপের Header বাটনটি ক্লিক করলে একটি Header Gallery List আসবে। ঐ Gallery List-এর মধ্যে থেকে যে কোন একটি Header কে চিহ্নিত করে তার মধ্যে থেকে ডকুমেন্ট ফাইলটির Title বা Header ব্যবহারকারী ইচ্ছেনুযায়ী লিখে ঐ ফাইলটির Header Title সেট করা যায়। Header এবং Footer Tool কে ডিজাইনস্ টুলস্ বলা হয়। ডিজাইন ট্যাবের মধ্যে অবস্থিত Go to Footer বাটনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পেজের সবচেয়ে নীচে Footer Area পাওয়া যায়। এছাড়াও Header Footer কমান্ডগ্রুপ থেকে Footer বাটনটিকে চিহ্নিত করলে একটি Footer Gallery খুলে যাবে যার মধ্যে Page Number, Document File টির নাম, তারিখ ইত্যাদি ব্যবহারকারীর ইচ্ছেনুযায়ী সেট করা যায়। Header Footer ডিজাইনস্ ট্যাবটির সাহায্যে Header Footer এর নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার পর Close বাটন-এ ক্লিক করলে Header Footer টি বন্ধ হয়ে যাবে।

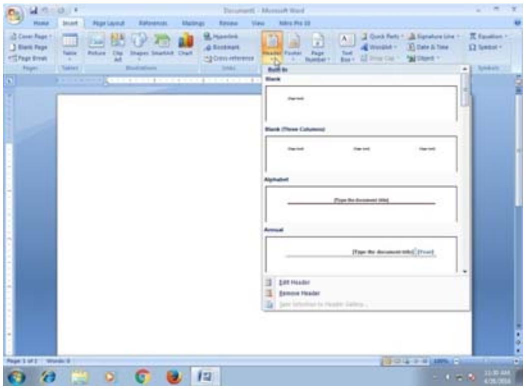

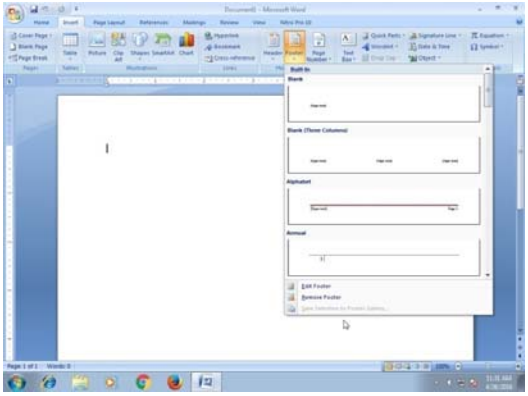

চিত্র ৩.১৫ : হেডার ও ফুটার

(ছ) পেজ নাম্বার (Page Number) - ডকুমেন্ট ফাইলের একাধিক Page এ ক্রমানুসারে সংখ্যা বা নাম্বার দেওয়ার জন্য Insert Tab থেকে Header Footer কমান্ডগ্রুপকে চিহ্নিত করে পেজ নাম্বার অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। এই পেজ নাম্বার অপশনের মধ্যে ব্যবহারকারী ইচ্ছানুযায়ী পেজ নাম্বার বা সংখ্যাটিকে পেজ বা পাতার উপরে বা ডানদিকে বা মাঝখানে বা নীচে বা পেজ মারজিন অনুযায়ী লিখতে পারে। এছাড়াও ডিজাইন ট্যাবের Header Footer কমান্ড গ্রুপের Dropdown Menu থেকে Format Page Number সাবমেনুটি ক্লিক করলে Page Number Format ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে। ঐ ডায়ালগ বক্সে Number Format Scroll Box থেকে পেজ নাম্বারের ফরম্যাটের যে কোন একটিকে চিহ্নিত করে Page Numbering Start at রেডিও (Radio) বাটনটিকে নির্বাচিত করতে হবে। এরপর ঐ Start at বাটনের ডকুমেন্ট ফাইলটির যে পাতা থেকে পেজ নাম্বারটি শুরু হবে সেটিকে চিহ্নিত করে OK বাটনটি ক্লিক করলে ডকুমেন্ট ফাইলের একাধিক পেজগুলির পরপর সংখ্যা, যথা 1-2-3 করে পেজ নাম্বার চলে আসবে।

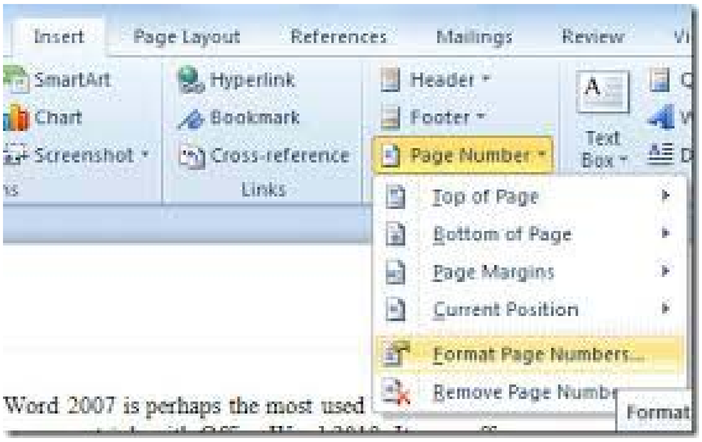

চিত্র ৩.১৬ : পেজ নাম্বার ফরম্যাট বক্স

(জ) সেকশন্ ব্রেক (Section Break) - একটি পেজে দুই, তিন বা ততোধিক কলম বা Section তৈরি করার জন্য Page Layout Tab-এর অন্তর্গত পেজ সেটআপ কমান্ডগ্রুপের মধ্যে অবস্থিত Column Drop Down Box গুলি থেকে যে কোনো একটি ব্যবহারকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী চিহ্নিত করে OK করলেই একটি নির্দিষ্ট পেজ-এ একাধিক Column অনুযায়ী লেখা বা Text টাইপ করা যাবে। এছাড়াও পেজ লে-আউট ট্যাবের পেজ সেট্ আপ কমান্ড গ্রুপের মধ্যে ডানদিকের সর্বাপেক্ষা উপরের অংশে অবস্থিত Insert Page & Section Break নামক একটি চারকোনা যুক্ত বক্সকে ক্লিক করলে Column Break অপশনটি পাওয়া যাবে।

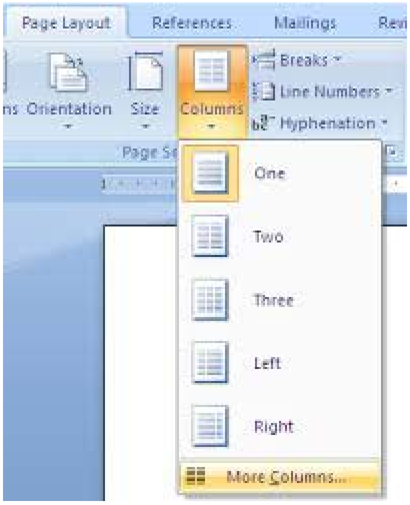

চিত্র ৩.১৭ : কলাম ডায়ালগ বক্স

৩.৬ টেবিল তৈরি করা (Inserting Table)

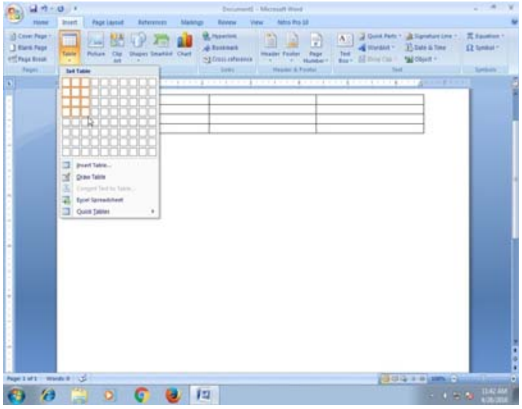

চিত্র ৩.১৮ : টেবিল তৈরি করা

কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে টেবিল ইনসার্ট করার প্রয়োজন হলে MS-Word র মেনুবারের Insert Tab-এর মধ্যে অবস্থিত Table Grid অপশন থেকে Table তৈরি করা যায়। নীচে ডকুমেন্টের মধ্যে টেবিল তৈরি করার পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

মাউসের সহায়তায় Table তৈরি করা

ডকুমেন্ট ফাইলের যে অংশে Table টি তৈরি করতে হবে সেই জায়গায় মাউসের পয়েন্টার নিয়ে গিয়ে ক্লিক করতে হবে। এরপর Insert Tab-এর মধ্যে অবস্থিত Table Group কে ক্লিক করলে Table Grid অপশনটি আসবে। ঐ অপশন থেকে ব্যবহারকারীর পছন্দ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত করা নির্দিষ্ট Table টির রো এবং কলাম (Column) সংখ্যা নির্ধারণ করে মাউস দ্বারা ক্লিক করলেই Tableটি ডকুমেন্ট ফাইলের নির্দিষ্ট অংশে উপনীত হবে।

টেবিল অপশনের দ্বারা টেবিল তৈরি করা

Insert Tab-এর মধ্যে অবস্থিত Table Group কমান্ড থেকে Table অপশনটি চিহ্নিত করে ক্লিক করলে Table ডায়লগ বক্সটি খুলে যাবে, যার মধ্যে রো এবং কলামের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত করে OK কমান্ড বাটনটি ক্লিক করলেই ঐ নির্দিষ্ট রো এবং কলামযুক্ত Tableটি ডকুমেন্ট ফাইলে চলে আসবে।

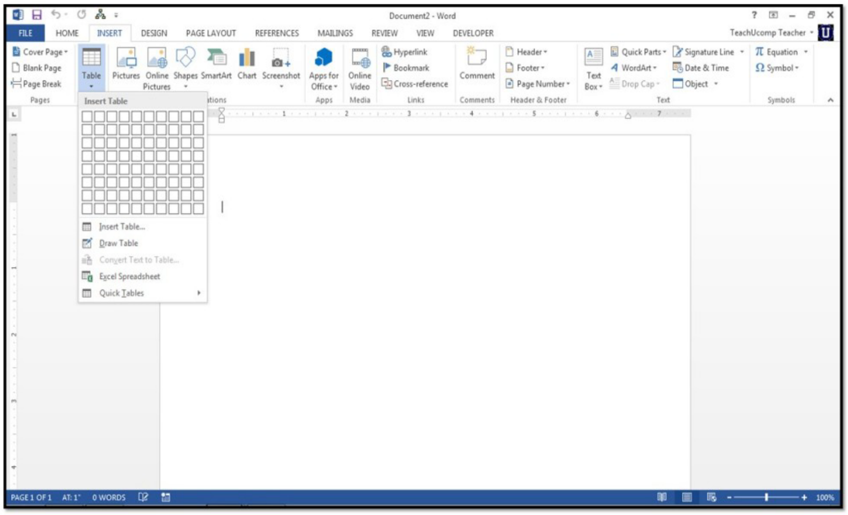

চিত্র ৩.১৯ : টেবিল অপশন থেকে টেবিল তৈরী করা

টেবিল-এ একাধিক সেল-কে একত্রিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সেল্‌কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করার পদ্ধতি **মার্জিং এবং স্প্লিটিং (Merging and Spliting)** নামে পরিচিত। একটি টেবিলের একাধিক সেল্‌কে একত্রিত করতে হলে যে সকল সেলগুলিকে একত্রিত করতে হবে, সেগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত হওয়া সেলগুলিকে সিলেক্ট করে Layout Contextual tab-এর মধ্যে অবস্থিত Merge Cells কমান্ডগ্রুপের Merge অপশনটি ক্লিক করলেই একাধিক সেলগুলি একত্রিত হয়ে একটি সেল-এ পরিণত হবে। কোনো টেবিলের মধ্যে একটি সেল্‌কে একাধিক ভাগে বিভক্ত করতে হলে টেবিলে অবস্থিত ঐ নির্দিষ্ট সেল্‌টিকে চিহ্নিত করার পর Layout Contextual Tab -এর মধ্যে অবস্থিত Merge কমান্ড গ্রুপের Split Cells অপশনটি ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে, যার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট Cell কতগুলি ভাগে বিভক্ত হবে সেই সংখ্যাটি নির্ধারিত করে OK বাটন ক্লিক করলেই ঐ সেলটি নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে যাবে।

৩.৭ চার্ট তৈরি (Preparing Chart)

কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাফ বা চার্ট ইনসার্ট করা সম্ভব।

ডকুমেন্ট ফাইলের যে অংশে চার্ট যুক্ত করতে হবে সেই জায়গায় কারসারটি রেখে ইনসার্ট ট্যাব-এর মধ্যে অবস্থিত Illustration কমান্ড গ্রুপের Chart অপশনটি ক্লিক করলে Insert Chart ডায়লগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে। ঐ ডায়লগ বক্সের মধ্যে যে কোন একটি টেমপ্লেট-এ অবস্থিত চার্ট প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত করে OK কমান্ড বাটন ক্লিক করলে ঐ নির্দিষ্ট চার্টটি চলে আসবে।

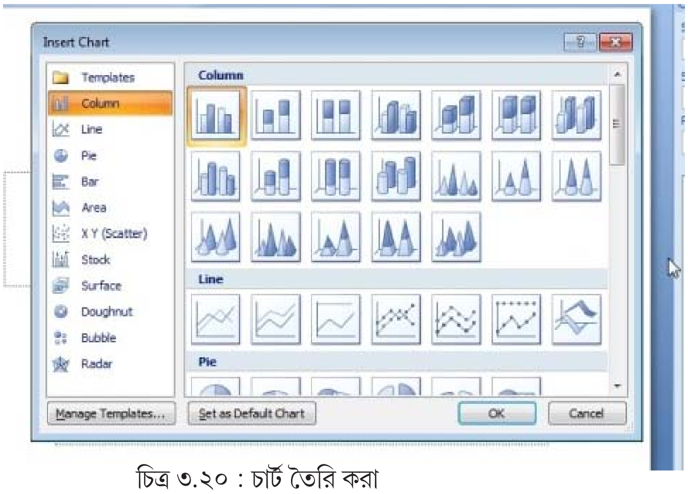

চিত্র ৩.২০ : চার্ট তৈরি করা

ডকুমেন্ট ফাইলে নির্দিষ্ট টেবিলের ডেটা বা তথ্য অনুযায়ী চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করাও সম্ভব। এই কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য ডকুমেন্ট ফাইলে অবস্থিত টেবিলটিকে প্রথমে সিলেক্ট বা নির্বাচিত করতে হবে। নির্বাচিত টেবিলের প্রথম রো-এর ডেটা শীটকে X-axis হিসাবে (অনুভূমিক অক্ষ বরাবর) নির্দিষ্ট নাম দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে এবং ঐ টেবিলের সর্বাপেক্ষা বামদিকের কলাম Y-axis হিসাবে (লম্বালম্বি অক্ষবরাবর) চিহ্নিত করতে হবে। এরপর চার্ট ডায়লগ বক্স থেকে নির্দিষ্ট চার্ট বা গ্রাফ নির্বাচন করে OK বাটন ক্লিক করলেই ঐ টেবিলের ডেটাশীট অনুযায়ী চার্ট বা গ্রাফটি ডকুমেন্ট ফাইলের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসবে।

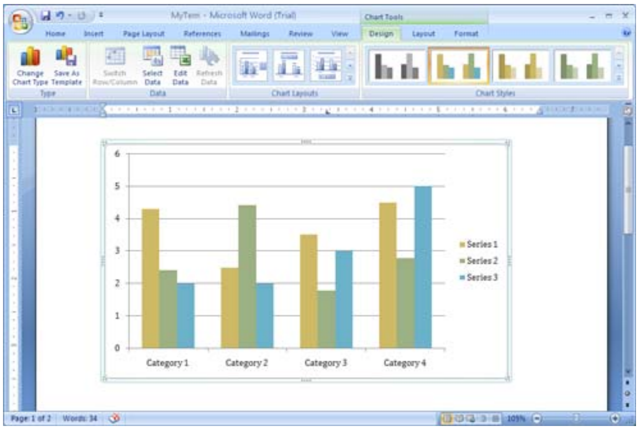

চিত্র ৩.২১ : ডেটা অনুযায়ী চার্ট তৈরী করা

৩.৮ প্রিন্টিং ডকুমেন্ট (Printing Document)

কোনো Word ডকুমেন্টকে প্রিন্ট করতে হলে File বাটনে ক্লিক করলে যে অপশনগুলি পাওয়া যাবে সেখান থেকে Print option টি select করতে হবে। এক্ষেত্রে যে ডায়লগ বক্সটি খুলবে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় option গুলি ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন—পিন্টারের নাম, কোন পেজগুলি প্রিন্ট করবেন বা সব পেজগুলি প্রিন্ট করবেন ইত্যাদি। সবশেষে Ok ক্লিক করলে পেজ বা ডকুমেন্টটি প্রিন্ট হয়ে যাবে। ডকুমেন্ট প্রিন্ট করার জন্য shortcut কী হল Ctrl+P।

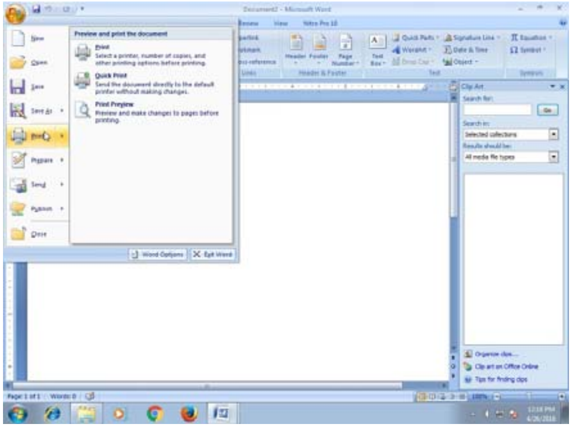

চিত্র ৩.২২ : ডকুমেন্ট প্রিন্টিং

প্রিন্ট করার আগে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট হলে কী রকম দেখতে হবে তা Print Preview-এর মাধ্যমে দেখা যায়। ডকুমেন্ট এর Print Preview দেখার জন্য shortcut কী হল Ctrl+F_2। Print Preview থেকে প্রিন্টও করা যায়। Print Preview থেকে back করার জন্য Close বাটন প্রেস করতে হবে।

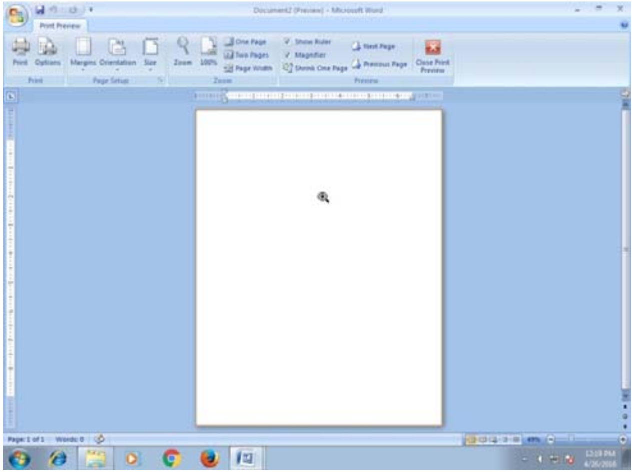

চিত্র ৩.২৩ : প্রিন্ট প্রিভিউ

৩.৯ MS-Word এ ব্যবহৃত কিছু প্রয়োজনীয় কী বোর্ড শর্টকার্ট

শর্ট কার্ট কী	**ব্যবহার**
Home	বর্তমান লাইনের শুরুতে কারসার মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
End	বর্তমান লাইনের শেষে কারসার মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
Page up	একটা স্ক্রিন উপরে কারসার মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
Page down	একটা স্ক্রিন নীচে কারসার মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + Home	একটি ডকুমেন্টের একেবারে শুরুতে মুভ করা যায় এর সাহায্যে।

Ctrl + End	একটি ডকুমেন্টের একেবারে শেষে মুভ করা যায় এর সাহায্যে।
Ctrl + Page up	বর্তমান স্ক্রিনের first character-এ মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + Page down	বর্তমান স্ক্রিনের last character-এ মুভ করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + →	একটা শব্দ ডান দিকে মুভ করা যায় এর সাহায্যে।
Ctrl + ←	একটা শব্দ বাম দিকে মুভ করা যায় এর সাহায্যে।
Ctrl + ↑	একটা Paragraph-এর প্রথমে মুভ করা যায় এর মাধ্যমে।
Ctrl + ↓	Next Paragraph-এর প্রথমে মুভ করা যায় এর মাধ্যমে।
Ctrl + C	Copy করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + X	Cut করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + V	Paste করতে ব্যবহৃত হয়।
Ctrl + P	Print করতে ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ

- কম্পিউটারের মাধ্যমে ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সাজিয়ে কোনো শব্দকে প্রকাশ করাকে বলা হয় ওয়ার্ড প্রসেসিং।
- ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করা, সেভ করা, কপি করা, পেস্ট করা, এডিট করা ইত্যাদি।
- Microsoft Office র MS-Word হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড প্রসেসিং tool.
- ওয়ার্ড ডকুমেন্টে Header ও Footer যোগ করা এবং প্রয়োজনমত Symbol, বুলেট, নাম্বার ইত্যাদি ব্যবহার করা সম্ভব।
- ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু সুন্দর স্টাইলে সাজানোর জন্য Word Art, Subscript এবং Superscript ব্যবহার করা যেতে পারে বা ক্লিপ আর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি ইনসার্ট করা যেতে পারে।
- একই বিষয়বস্তুর চিঠি ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য মেইল মার্জ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

Word Processing, Formating, Undo, Redo, Clip Board, Header/Footer, Subscript/Superscript, Clip Art, Symbol, Tab Setting, Mail Marge.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) MS Word কীভাবে ওপেন করা হয়?

(২) কোনো ডকুমেন্টকে কীভাবে সেভ করা হয়?

(৩) H_2SO_4 কীভাবে লেখা যায় তা বর্ণনা করো।

(৪) একটি MS-Word ডকুমেন্টে Clip Art কীভাবে ব্যবহার করা হয় লেখো।

(৫) Header এবং Footer কী? MS-Word এ Header এবং Footer কীভাবে যোগ করা হয়?

(৬) MS-Word এ কীভাবে টেবিল তৈরি করা হয় উদাহরণসহযোগে তাহা আলোচনা করো।

(৭) একটি ডকুমেন্ট কীভাবে প্রিন্ট করা যায় তার ধাপগুলি লেখো।

(৮) মেইল মার্জ পদ্ধতিটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।

(৯) পার্থক্য লেখো :

(ক) Save ও Save As

(খ) Copy ও Cut

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ১০ টি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো এবং নিম্নলিখিত ফরমাটিংগুলি ওই অনুচ্ছেদে প্রয়োগ করো। BOLD, ITALIC, UNDERLINE, CENTER ALIGNMENT, DIFFERENT LINE SPACING OPTION, INDENTATION.

(২) পাঁচটি কলাম এবং চারটি রো বিশিষ্ট একটি টেবিল তৈরি করো এবং ডেটা দিয়ে fill up করো।

(৩) ডি.এল.এড কোর্সের শংসাপত্র (Certificate) প্রস্তুত করো।

(৪) পাঁচটি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্যারা টিচার পদের জন্য একটি আবেদনপত্র তৈরি করো—মেইল মার্জের মাধ্যমে।

অধ্যায়

৪

এম এস এক্সেল

৪.১ সূচনা (Introduction)

স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম হল একটি অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার, যেখানে ডাটা রো (Row) এবং কলাম (Colume) বরাবর সজ্জিত করে প্রধানত বিভিন্ন গাণিতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করা হয়। MS-Office প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস টুল Microsoft Excel বা MS-Excel হল একটি শক্তিশালী Spreadsheet সফ্‌টওয়্যার যার সাহায্যে বিভিন্ন গাণিতিক কাজ তাড়াতাড়ি এবং সহজে করা যায়। এছাড়াও Excel-এর সাহায্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট, গ্রাফ অঙ্কন ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়।

Excel-এ তৈরি কোনো ফাইলকে বলা হয় Workbook ।একটি Workbook -এ একাধিক Work sheet থাকে। MS-Excel এ Work sheet-এ ডাটা ইনসার্ট করে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। MS-Excel -এ কাজ করতে হলে নীচের পর্যায়গুলি অনুসরণ করতে হবে–

- Windows -এর Start বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- যে মেনু প্রদর্শিত হবে তার মধ্যে থেকে All Programs সিলেক্ট করতে হবে।
- যে প্রোগ্রামের তালিকা আসবে তার থেকে Microsoft Office সিলেক্ট করতে হবে।
- Microsoft Office -এর অন্তর্গত প্রোগ্রামগুলির মধ্যে Microsoft Office Excel-এ ক্লিক করলে একটি ব্ল্যাঙ্ক Excel Workbook খুলে যাবে। এখানে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel

এই অধ্যায় থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।

(1) শিক্ষার্থীরা Worksheet -এর ধারণা লাভ করবে, Worksheet-এ কী করে বিভিন্ন ধরনের ডাটা এন্ট্রি করতে হয় এবং সেই ডাটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে জানতে পারবে।

(2) Excel Worksheet -এ কী করে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ বা চার্ট তৈরি করা যায় সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাবে।

(3) Excel-কে বিভিন্ন কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কিছু সাধারণ ফর্মুলার ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পারা যাবে।

৪.২ ওয়ার্কশীট (Worksheet)

Ms-Excel খোলার সঙ্গে সঙ্গে Book 1 নামে চিহ্নিত Excel Workbook টি দৃশ্যমান হয় যাতে by default তিনটি worksheet থাকে। প্রয়োজনবোধে নতুন worksheet যোগ করা যায়। Workbook-এর বিভিন্ন অংশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হয়েছে।

Microsoft Office Button : Excel 2007 Workbook-এর উইন্ডোজের উপরের অংশের বাঁ দিকের কোণে রয়েছে গোলাকার Microsoft Office Button ।এই Button -এ Click করলে যে মেনু আসে সেই মেনু ব্যবহার করে নতুন ফাইল তৈরি করা, পুরোনো ফাইল খোলা (Open) ও বন্ধ (Close) করা, ফাইল সেভ (Save) করা, worksheet print করা, ই-মেল করে অ্যাটাচমেন্ট পাঠানো, Excel থেকে বেরিয়ে আসা (Exit) ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়।

Quick Access Tool bar : Microsoft Office Button-এর ঠিক পাশেই রয়েছে এই Tool bar যেখানে বারবার ব্যবহৃত হয় এমন Command গুলি, যেমন Save, Undo, Redo ইত্যাদি আইকনগুলি থাকে। এই আইকনগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন কার্য খুব সহজে সম্পন্ন করা যায়। Ms-Excel- এ কাজ করার সময় User বা ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো tool-কে Quick Access Toolbar-এ যুক্ত করতে এবং বাদ দিতে পারে। এই Toolbar-এর Drop Down Arrow-তে ক্লিক করলে Customize Quick Access Toolbarটি দৃশ্যমান হবে।

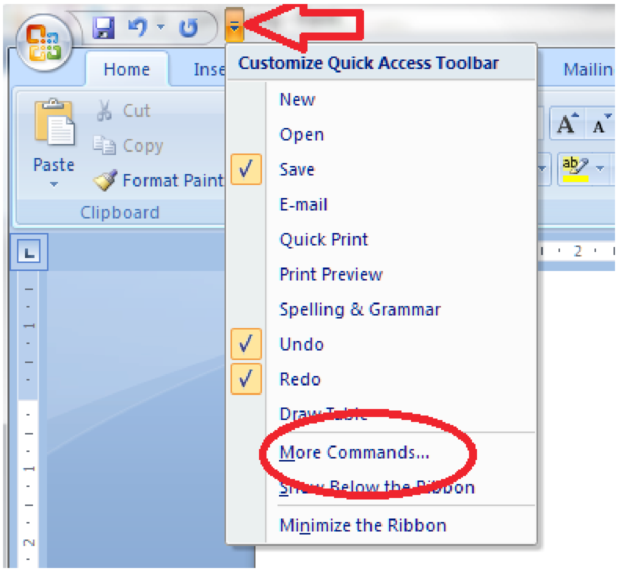

চিত্র ৪.১ : অ্যাক্সেস টুলবার

যে tool টি toolbar-এ যুক্ত করা হবে তার ওপর Mouse Click করলে বামপাশে একটি টিক্ চিহ্ন ✓ আসবে এবং toolটি Quick Access Toolbar-এ দেখা যাবে। এই Toolbar থেকে কোনো tool-কে বাদ দিতে হলে Customize Quick Access Toolbar-এ সেই tool-এর পাশে টিক চিহ্নে ✓ ক্লিক করলে tool-টি Quick Access Toolbar-এ দেখা যাবে না।

Title Bar : Excel উইন্ডোর একেবারে উপরে অবস্থিত এই Bar টিতে থাকে প্রোগ্রামের নাম ও ফাইলের (workbook) নাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে “Microsoft Excel-Book 1”।

Ribbon : Excel 2007 -এর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল Quick Access Toolbar-এর নীচে অবস্থিত Ribbon Tab সমূহ। By default এখানে Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review এবং View এই সাতটি Ribbon দেখা যায়। প্রতিটি Ribbon-এ রয়েছে কয়েকটি Command Group যাদের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে সম্পর্কযুক্ত Command button। উদাহরণস্বরূপ, Home Ribbon ট্যাব-এ অবস্থিত Command Group গুলি হল Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells ইত্যাদি।

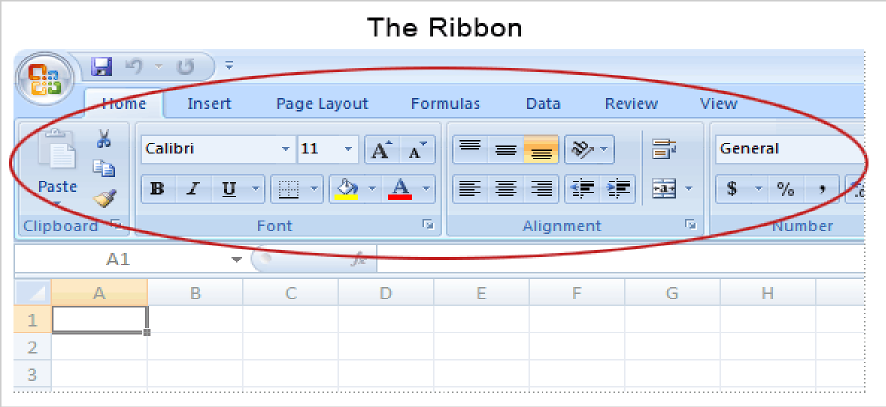

চিত্র ৪.২ : রিবন ট্যাব

Worksheet : Worksheet হল Workbook-এর এক একটি Page। একটি Excel ফাইল বা Workbook-এ প্রাথমিকভাবে তিনটি Worksheet থাকে। প্রয়োজনে Sheet-এর সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যায়। একটি Excel Worksheet-এ অনুভূমিকভাবে (horizontally) যে বার গুলি দৃশ্যমান হয় তাদের Row বলা হয়। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত 1,2,3,4,.... করে Row গুলির নাম্বার দেওয়া থাকে। একটি Worksheet -এ এই রকম Row-এর মোট সংখ্যা 1,048,576। Worksheet-এ লম্বভাবে অবস্থিত বার গুলিকে Column বলে। Column গুলির মাথায় A,B,C,D,.... করে নাম লেখা থাকে। Worksheet -এ মোট Column সংখ্যা হল 16,384। একটি Row ও একটি Column-এর সংযোগস্থল cell নামে পরিচিত। Column এবং Row এর নাম অনুযায়ী cell-এর নামকরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ 10 নং Row ও E Column এর সংযোগস্থলে যে cell তৈরি হবে তার নাম বা অ্যাড্রেস হবে E10। কোনো নির্দিষ্ট সেলের ওপর Mouse Pointer দ্বারা ক্লিক করলে সেই সেলটি সিলেক্ট হয়। এই সেলটিকে Active Cell বা Cell Pointer বলে। Active Cell একটি মোটা লাইন দ্বারা আবৃত থাকে। Active Cell-এর নীচে ডান দিকের কোণে একটি ছোটো কালো বক্স দেখা যায়, একে Fill Handle বলা হয়। Worksheet-এর মধ্যে Cell Pointerটি বিভিন্ন অ্যারো কী-র সাহায্যে উপরে, নীচে, ডানদিকে বা বামদিকে সরানো যায়। Excel -এ একসঙ্গে অনেকগুলি Worksheet যোগ করা যায় এবং তাদের Sheet1, Sheet 2 ইত্যাদি default নামের বদলে আলাদা আলাদা নামকরণ করা যায়।

Formula Bar : Ribbon ট্যাবের নীচে সাদা অনুভূমিক অংশটি হল Formula Bar। এই অংশে সাধারণত কোনো ফর্মূলা লেখা হয় অথবা কোনো cell-এ ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ডাটা টাইপ করা হয়। আবার কোনো cell-এ ডাটা লেখা হলে সেটি Formula Bar-এ দেখা যায়।

Name Box : Formula Bar-এর ঠিক বামদিকে রয়েছে Name Box । এই Box-এ বর্তমানে সিলেক্ট হওয়া কোনো একটি সেল বা কোনো সেল রেঞ্জের Address প্রদর্শিত হয়।

Scroll Bar : Worksheet কে উপরে নীচে অথবা ডাইনে বা বামে সরানোর জন্য যথাক্রমে Vertical ও Horizontal Scroll Bar ব্যবহৃত হয়।

Sheet Tab: এই Tab-এ Click করে একটি Worksheet থেকে অন্য Worksheet এ যাওয়া যায়। যে Sheet tab-এ ক্লিক করা হয় সেই Sheet-টি Active থাকে। কোনো একটি Worksheet সিলেক্ট থাকা অবস্থায় mouse-এর right button click করলে প্রাপ্ত মেনু থেকে নতুন sheet insert করা, sheet delete করা, sheet-এর নাম পরিবর্তন করা, sheet copy বা move করা ইত্যাদি কাজগুলি করা যায়।

Status Bar: এই Bar Excel উইন্ডোর একদম নীচের দিকে অবস্থিত। Status Bar বিশেষ কিছু কী, যেমন Caps Lock, Scroll Lock ইত্যাদি On অথবা Off অবস্থায় থাকলে তা প্রদর্শন করে। এই বারে Ready লেখাটি দৃশ্যমান হলে বুঝতে হবে Cursor Worksheet Cell-এ অবস্থান করছে এবং এই অবস্থায় Worksheet-এ লেখা যাবে।

৪.২.১ ওয়ার্কশীটে ডাটা এন্ট্রি করা (Data Entry in Worksheet)

এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে কি ধরনের ডাটা Excel Worksheet-এ এন্ট্রি করা যায় সেই সম্পর্কে জানা আবশ্যক। MS-Excel, এন্ট্রি করা ডাটা কি ধরনের তা চিহ্নিত করতে সক্ষম, Excel-কে ডাটার ধরন বলে দিতে হয় না। Excel Worksheet-এ সাধারণত চার ধরনের ডাটা এন্ট্রি করা যায়। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

Labels বা Text : এই ধরনের ডাটা হল ইংরেজী বর্ণমালার ভিত্তিতে লেখা বর্ণনামূলক তথ্য, যেমন কোনো ব্যক্তির নাম বা মাসের নাম, কোনো বাক্য ইত্যাদি। text ডাটা A-Z পর্যন্ত বর্ণ, 0-9 পর্যন্ত সংখ্যা বা @, #, $, & প্রভৃতি বিশেষ চিহ্ন দিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ''My name is Sachin'' উক্তিটি Excel-এর কাছে label বা text হিসাবে গণ্য হয়। ''There are 4 numbers''-এটিও একটি textual data। এই ধরনের ডাটার ওপর কোনো Mathematical operation করা যায় না।

Value বা Number : এই ধরনের ডাটা হল সংখ্যা বা number । যেমন 235 Excel এর কাছে value হিসাবে পরিগণিত হয়, কিন্তু ''Number 235'' Label বা text হিসাবে গণ্য হয়। এখানে বড় সংখ্যার সঙ্গে কমা (comma) এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন মুদ্রার (currency) চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের ডাটার ওপর সহজেই mathematical operation করা যায়।

Date এবং Time : Excel date এবং time কে পৃথক ডাটা টাইপ হিসাবে গণ্য করে। উদাহরণস্বরূপঃ 14-Mar-01, Mar-01, 03-14-01 ইত্যাদি বিভিন্ন Format-এ Date Excel-এ লেখা যায়। 1:30:55 PM, 13:30, 1:30 PM, 13:30:55, 13:30:55 PM ইত্যাদি হল Time ডাটার-এ উদাহরণ।

Boolean Value : উপরিউক্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের data ব্যবহৃত হয় না, তবে logical formula-তে Boolean Value ব্যবহৃত হয়।

Excel এর কোন cell-এ কিছু লিখতে প্রথমে ওই cell টিকে select করে নিতে হয়। এরপর Key Board এর সাহায্যে টাইপ করে তারপর Enter প্রেস করতে হবে। তাহলে cell pointer ঠিক নির্দিষ্ট সেলের নীচের সেলে চলে আসবে এবং টাইপ করা ডাটা আগের cell-এ এন্ট্রি হবে। বিকল্প পদ্ধতিতে কোনো cell-এ cursor রেখে Formula Bar-এ গিয়ে কোনো লেখা টাইপ করলে তা ওই cell-এ এন্ট্রি হয়ে যায়। cell-এ ডাটা এন্ট্রি-হওয়ার পর Excel সেই ডাটার টাইপ অনুযায়ী ডাটা align করে। তবে ব্যবহারকারী সেই alignment পরে পরিবর্তন করতে পারে। Excel text data-কে cell-এর বামদিকে align করে, Value বা number-কে cell-এর ডানদিকে align করে এবং Date-কেও cell-এর ডানদিকে align করে। কোনো cell-এ label বা text এন্ট্রি করার সময় প্রথম কয়েকটি অক্ষর টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গে সমজাতীয় label (ওই কটি অক্ষর দ্বারা শুরু এমন কোনো label যদি অন্য cell-এ এন্ট্রি করা থাকে) দিয়ে Excel ওই cell টিকে পূর্ণ করে দেয়। Data এন্ট্রির ক্ষেত্রে Excel-এর এই বৈশিষ্ট্যই হল Autocomplete। Excel-এর এই বৈশিষ্ট্যর জন্য সমজাতীয় label টাইপ করা সহজসাধ্য হয়। কোনো cell-এ এন্ট্রি করা Value-এর width যদি cell-width থেকে বেশি হয় তবে Excel ঐ cell টিকে কয়েকটি # চিহ্ন দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। Value বা number টিকে যথাযথভাবে দেখাতে হলে ওই cell-এর width প্রয়োজনমত বাড়িয়ে নিতে হবে। কিছু কিছু ডাটা নাম্বার হলেও তা টেক্সট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন টেলিফোন নাম্বার, পিন কোড ইত্যাদি। যদি কোন নাম্বারকে টেক্সট হিসাবে এন্ট্রি করার প্রয়োজন হয় তাহলে নাম্বার লেখার শুরুতে একটি single quotation mark (') টাইপ করতে হবে এবং তারপর নাম্বার টাইপ করতে হবে। এইভাবে টাইপ করা কোনো নাম্বারকে Excel টেক্সট হিসাবে বিবেচনা করে এবং তার alignment বামদিকে হয়।

৪.৩ ডাটা এডিটিং (Data Editing)

Excel worksheet এর কোনো cell-এ ডাটা এন্ট্রি করার পর যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয় তাহলে cell-এ Double Click করলে কারসর cell-এ চলে আসবে এবং cell-এর ডাটা edit করা যাবে। Excel এ ডাটা এডিটিং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ডাটা ফরম্যাটিং (Data Formatting)

Excel Worksheet-এর বিভিন্ন cell-এ এন্ট্রি করা টেক্সট, সংখ্যা ইত্যাদি Font, Size, ও Colour সহযোগে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করার পদ্ধতিকে Cell formatting বলে। Home Ribbon-এ Font, Alignment, Number, প্রভৃতি Command group-এর

বাটনগুলির সাহায্যে command group নীচের ডানদিকে dialog box launcher-এ ক্লিক করে শেষপ্রান্তে Format Cells dialog box-এর বিভিন্ন option ব্যবহার করে ডাটা সমূহের Formatting করা যায়। আবার কোনো cell-এ ডাটা এন্ট্রির পর ওই cell-এ Right click করে প্রান্ত মেনু থেকে ‘‘Format Cells’’-এ click করলেও ‘‘Format Cells’’ dialog box খুলে যাবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাব আছে, যেমন Number, Alignment, Font, Border, Fill এবং Protection। এই ট্যাব গুলি থেকে বিভিন্ন ধরনের Formating অপশন সিলেক্ট করে data format করা যায়।

Number ট্যাব : এই ট্যাব-এর সাহায্যে কোনো cell -এ কী ধরনের ডাটা ইনসার্ট করা হবে তা ঠিক করা হয়। সাধারণভাবে Category List থেকে প্রয়োজনীয় Data type (General, Number, Currency, Date Time ইত্যাদি) সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করা হয়।

Alignment ট্যাব : একটি cell-এ ডাটা ইনসার্ট করানোর পর তা অনুভূমিক বা লম্ব বরাবর ওই cell-এ কীভাবে সজ্জিত হবে তা নির্ধারণ করে Alignment ট্যাব। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে ডাটাকে একটি cell-এ বিভিন্ন কোণ (angle) করেও রাখা যায়। কোনো cell-এ এন্ট্রি করা ডাটা যদি ঐ cell-এর প্রসার বা width থেকে বড় হয় তাহলে লেখাটির অংশ পাশের cell-এ চলে যায়। কিন্তু Alignment ট্যাবের Wrap Text option সিলেক্ট করলে ঐ cell-এর লেখাটি পাশের cell-এ না গিয়ে ঐ cell-এর নীচের দিকে চলে আসে। এর ফলে ঐ cell-এর height কিছুটা বেড়ে যায়।

Font ট্যাব : Font এর নাম, Font এর স্টাইল (Regular, Italic, Bold ইত্যাদি) Font-এর সাইজ, underline কি রকম হবে, লেখার কালার, Effects ইত্যাদি এই ট্যাবের অন্তর্গত বিভিন্ন অপশনের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়।

Border ট্যাব : এই ট্যাব এর সাহায্যে কোন cell বা সিলেক্টেড cell সমুহের চারপাশে প্রয়োজন মত বর্ডার দেওয়া যায়। বর্ডারের style (single line, double line, dotted line ইত্যাদি) এবং colour ও এই ট্যাবের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।

Fill ট্যাব : কোনো cell-এর ভেতরের অংশ বা background-এ কোনো colour বা বিশেষ pattern দিতে হলে এই ট্যাবটি ব্যবহৃত হয়।

Protect ট্যাব : এক বা একাধিক Cell-কে Protect করা যায় Protection ট্যাবের মাধ্যমে। এর ফলে ঐ Cell গুলির কোনো ডাটা পরিবর্তন বা delete করা যায় না। কোনো Cell Protect করার জন্য Protection ট্যাবের Locked চেক বক্সে ক্লিক করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কোনো cell-কে Protect করার আগে অবশ্যই Worksheet-কে Protect করতে হবে Review ট্যাবের Protect sheet বাটনের মাধ্যমে।

তথ্য কপি ও পেস্ট করা (Copy and Paste of Information)

MS-Excel এ ডাটা কপি ও পেস্ট করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

- যে cell বা cell গুলির তথ্য কপি করতে হবে প্রথমে সেই cell বা cell গুলিকে সিলেক্ট করতে হবে।
- Ribbon-এর Home ট্যাব-এ Clipboard command group এর Copy বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা কী বোর্ড থেকে Ctrl+C প্রেস করতে হবে। ওই cell বা cell Range -এর ডাটার কপি Excel clipboard-এ চলে যাবে।
- যে cell-এ ডাটা কপি করে নিয়ে যেতে হবে সেই cell এ Mouse Pointer রাখতে হবে।
- Clipboard Command Group-এর Paste বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা কী-বোর্ড থেকে Ctrl+V প্রেস করতে হবে। তাহলে clip board-এর ডাটা selected cell-এ paste হয়ে যাবে।

ড্রাগ ও ড্রপ (Drag and Drop)

Excel এ Drag ও Drop প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও ডাটা কপি করা যায়। এই কার্যটি সম্পন্ন করতে হলে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- যে cell বা cell গুলির তথ্য কপি করতে হবে প্রথমে সেই cell বা cell গুলিকে সিলেক্ট করতে হবে।
- সিলেক্টেড cell বা cell গুলির বর্ডারের ওপর দিয়ে Mouse Pointer নিয়ে গেলে Pointer-টি একটি arrow-তে পরিবর্তীত হবে।
- এবার ctrl key চেপে রেখে উক্ত সিলেক্টেড সেল বা সেলগুলির বর্ডার ধরে drag করলে ওই তথ্য অন্য blank cell-এ কপি হয়ে যাবে।

তথ্য কাট ও পেস্ট করা (Cut and Copy of Information)

MS-Excel এ ডাটা কাট ও পেস্ট করার পদ্ধতি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

- কোনো cell-এর ডাটা কাট (cut) করলে সেই cell থেকে ডাটাটি মুছে যায়।
- যে cell বা cell গুলির ডাটা কাট (cut) করতে হবে সেই cell বা cell গুলি select করে Ribbon-এর Home ট্যাব-এর clipboard command group-এর cut বাটনে ক্লিক করতে হবে অথবা কী-বোর্ডের Ctrl+X কী দুটি প্রেস করতে হবে।
- যে cell-এ ওই ডাটা পেস্ট (paste) হবে সেই cell-টি তে mouse pointer রেখে clipboard command group-এর paste বাটনে ক্লিক করলে অথবা কী-বোর্ডের Ctrl+V কী দুটি প্রেস করলে ডাটা ওই cell-এ পেস্ট হয়ে যাবে।

৪.৪ ওয়ার্কবুক নিয়ে কাজ করা (Working with Workbook)

MS-Excel এ workbook এ যে সমস্ত বিভিন্ন অপারেশনগুলি সম্পন্ন করা যায় সেই সম্পর্কে এখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) নতুন ওয়ার্কবুক তৈরি করা (Creating New Workbook)

Ms-Excel 2007 খুললে একটি blank workbook screen-এ দেখা যায় যার title bar-এ Book1 লেখা থাকে। এছাড়াও Excel চালু থাকা অবস্থায় এক বা একাধিক নতুন Workbook তৈরি করা যায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে।

- Office button-এ ক্লিক করে New Command-এ ক্লিক করলে New Workbook dialog box screen-এ দেখা যাবে।
- Blank and recent বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- এরপর Create button-এ ক্লিক করলে একটি নতুন workbook তৈরি হবে।

(খ) ওয়ার্কবুক সেভ করা (Saving the Workbook)

Worksheet-এ প্রয়োজনীয় ডাটা এন্ট্রি করার পর সেই ডাটা save করতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে:

- Microsoft Office button-এ ক্লিক করে Save বা Save As command-এ ক্লিক করতে হবে। Save As dialog box screen-এ প্রদর্শিত হবে।
- File Name Box -এ File-এর একটি যুক্তিপূর্ণ নাম লিখতে হবে।
- Save button-এ click করতে হবে।

কী -বোর্ডের সাহায্যে সেভ করতে চাইলে Ctrl+S প্রেস করতে হবে। Excel 2007-এ File name এর Extension হল .xlsx।

(গ) ওয়ার্কবুক খোলা (Opening a Workbook)

কোনো existing ওয়ার্কবুক ওপেন করতে হলে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- Office button-এ ক্লিক করে open command-এ ক্লিক করতে হবে অথবা কী-বোর্ড থেকে (Ctrl+O) কী-দুটি প্রেস করতে হবে।

- Server-এ আসা open dialog box থেকে look in টেক্সট বক্সের অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করে save করা workbook-এর অবস্থান (location) সিলেক্ট করতে হবে।
- নির্দিষ্ট workbook বা ফাইলটি সিলেক্ট করে open button-এ ক্লিক করলে ফাইলটি ওপেন হবে।

(ঘ) সেলের তথ্য মুছে ফেলা (Deleting Cell Information)

কোনো নির্দিষ্ট cell এর তথ্য মুছে ফেলতে হলে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- এক বা একাধিক cell-এর তথ্য মুছে ফেলতে cell বা cell গুলিকে সিলেক্ট করতে হবে।
- কী-বোর্ডের delete key প্রেস করতে হবে। এক্ষেত্রে সিলেক্টেড সেলগুলির তথ্য মুছে যাবে।

(ঙ) নতুন রো ইনসার্ট করা (Inserting New Row)

Worksheet নিয়ে কাজ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে নতুন row ইনসার্ট করার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করে worksheet এ নতুন row ইনসার্ট করা যেতে পারে।

- যে Row-এর উপরে নতুন Row ইনসার্ট করতে হবে সেই Row এর হেডিং-এ click করে Rowটি সিলেক্ট করতে হবে (একটি মাত্র Row ইনসার্ট করতে হলে)। একাধিক Row ইনসার্ট করতে হলে সেই Row গুলিকে সিলেক্ট করতে হবে যার উপরে আমরা একাধিক Row ইনসার্ট করতে চাই।
- Ribbon-এর Home ট্যাব এর Cells Command group এর Insert button-এ ক্লিক করে প্রাপ্ত মেনুর Insert Sheet Rows-এ ক্লিক করলে প্রত্যেকবার একটি নতুন Row যুক্ত হবে।

(চ) নতুন কলাম ইনসার্ট করা (Inserting New Column)— Worksheet এ নতুন column ইনসার্ট করার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- একটি মাত্র Column ইনসার্ট করতে হলে সেই Column এর হেডিং-এ ক্লিক করে columnটি সিলেক্ট করতে হবে যার বামদিকে নতুন Column ইনসার্ট হবে। একাধিক Column ইনসার্ট করতে হলে সেই Column গুলিকে সিলেক্ট করতে হবে যাদের বামদিকে নতুন Column গুলি ইনসার্ট করতে হবে।
- Home ট্যাব-এর cells command group-এর Insert button-এ ক্লিক করে Insert Sheet Column-সিলেক্ট করলে প্রত্যেকবার একটি নতুন column তৈরী হবে।

(ছ) সেল, রো বা কলাম ডিলিট করা (Deleting Cell, Row or Column)—কোনো Worksheet থেকে Cell, Row বা Column delete করার পদ্ধতি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

- প্রথমে Cell, Row বা Column সিলেক্ট করতে হবে যা delete করতে হবে।
- সিলেক্টেড cell delete করতে হলে Home tab → Cells → Delete → Delete Cells এই পর্যায়গুলি অনুসরণ করতে হবে।
- সিলেক্টেড Row গুলি delete করতে হলে Home tab → Cells → Delete → Delete Sheet Rows এই ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।
- সিলেক্টেড Column গুলি delete করতে হলে Home tab → Cells → Delete → Delete Sheet Column এই ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

(জ) রো ও কলাম রিসাইজ করা (Resizing Row and Column)

মাউস পয়েন্টারকে দুটি Row বা দুটি Column হেডারের বর্ডারে আনলে তা যখন ⟺আকার নেবে তখন মাউস ক্লিক করে এবং drag করে Row বা Column কে খুব সহজেই Resize করা যায়। এছাড়া মাউস পয়েন্টারকে দুটি Row বা দুটি Column label-এর

বর্ডারে আনলে তা যখন + আকার নেবে তখন মাউস double click করলে সেই Row বা Column automatically Cell এর data অনুযায়ী resize হবে।

Row Resize করার বিকল্প পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

- যে Row-এর height বাড়াতে হবে সেই Row-এর হেডারে ক্লিক করে সম্পূর্ণ Row সিলেক্ট করতে হবে।
- Home ট্যাবের Cells Command Group-এর format button-এ ক্লিক করে row height-এ ক্লিক করলে row height dialog box দৃশ্যমান হবে।
- এই box-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যা লিখে ok বাটনে ক্লিক করলে row height পরিবর্তিত হবে।

Column Resize করার বিকল্প পদ্ধতি নীচে দেখানো হয়েছে।

- Column হেডারে ক্লিক করে সম্পূর্ণ columnটি সিলেক্ট করতে হবে।
- Home ট্যাবের Cells Command Group-এর Format button-এ ক্লিক করে column width-এ ক্লিক করলে column width dialog box প্রদর্শিত হবে।
- এই box-এ প্রয়োজনীয় column width লিখে ok button-এ ক্লিক করলে column width-এর পরিবর্তন হবে।

(ঝ) অটোফিল (Auto Fill)

অটোফিল পদ্ধতির সাহায্যে worksheet-এর কোনো নির্দিষ্ট column বা row-তে একই ধরনের ডাটা, sequential data, ফর্মুলা ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে ইনসার্ট করা যায়। নীচের উদাহরণে Fill Handle ব্যবহার করে কীভাবে অটোফিল করা যায় তা দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ: সপ্তাহের সাত দিনের নাম (Sunday — Saturday) অটোফিল করার পদ্ধতি ঃ

(i) Worksheet এর কোনো cell-এ Sunday টাইপ করতে হবে।

(ii) Sunday লেখা cell-টি সিলেক্ট করে Fill Handle-এ Mouse Pointer আনলে Pointerটি + চিহ্নে পরিণত হবে।

(iii) Mouse-এর left buttonটি চেপে নীচের দিকে drag করতে হবে এবং Saturday লেখাটি আসার পর dragging বন্ধ করতে হবে। এর ফলে Sunday থেকে Saturday পর্যন্ত সপ্তাহের সাত দিনের নাম cell গুলিতে ইনসার্ট হয়ে যাবে।

উদাহরণ: 1 থেকে 10 পর্যন্ত বা তার বেশি সংখ্যাগুলিকে সেলে ধারাবাহিকভাবে ফিল করার পদ্ধতি।

(i) প্রথমে একটি cell-এ 1 এবং তার ঠিক নীচের cell-এ 2 টাইপ করতে হবে।

(ii) এরপর 1 এবং 2 লেখা cell দুটিকে একসাথে সিলেক্ট করতে হবে।

(iii) 2 লেখা সেলটির Fill Handle-এ mouse pointer এনে left mouse button চেপে ধরে নীচের দিকে cell গুলিতে drag করতে হবে।

(iv) পরপর 3,4,5,6.......... সংখ্যাগুলি দৃশ্যমান হবে এবং 10 লেখাটি প্রদর্শিত হওয়ার পর mouse buttonটি ছেড়ে দিতে হবে।

৪.৫ ডাটা হ্যান্ডেলিং (Data Handling)

MS-Excel এ ডাটা Handling সংক্রান্ত বিষয়গুলি, যেমন ডাটা ফিল, ডাটা sorting, ডাটা ফিল্টার প্রভৃতি খুব সহজেই করা সম্ভব। ডাটা সংক্রান্ত এই কার্যগুলি MS-Excel এ ডাটা (Data) মেনু ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়। ডাটা sorting কীভাবে করা যায় নীচে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ডাটা সর্টিং (Data Sorting)

Worksheet-এ Column বা Row-তে লেখা ডাটা (text ও number)-সমূহ মানের ক্রমানুসারে সাজানোর পদ্ধতিকে ডাটা সর্টিং (Data Sorting) বলা হয়। একই column বা row-এর সংখ্যাগুলিকে ছোট থেকে বড় এবং text গুলিকে A→Z অনুসারে সাজানোকে Ascending Order এ সজ্জিত বলা হয়। একইভাবে সংখ্যাগুলিকে বড় থেকে ছোট এবং text গুলিকে Z→A অনুসারে সাজানোকে Descending Order এ সজ্জিত বলা হয়।

একটি Column বা Row-এর ওপর Sorting করা

(i) যে Column বা Row-এর অন্তর্গত cell গুলির ডাটা sort করতে হবে সেই cell গুলি সিলেক্ট করতে হবে।

(ii) Ribbon-এর Home ট্যাবের Editing Command Group-এর Sort & Filter বাটনে ক্লিক করে প্রান্ত menu থেকে Sort A to Z-এ ক্লিক করলে cell-এর ডাটা গুলি Ascending Order-এ সজ্জিত হবে। একইভাবে Z to A Option-এ ক্লিক করলে ডাটাগুলি Descending Order-এ সজ্জিত হবে।

একাধিক Column এর ওপর Sorting করা

(i) যে সকল Column বা Row-এর ডাটা sort করতে হবে সেগুলিকে সিলেক্ট করতে হবে।

(ii) Ribbon-এর Home ট্যাবের Editing Command Group-এর Sort & Filter বাটনে ক্লিক করে প্রাপ্ত menu থেকে Custom Sort-এ ক্লিক করতে হবে। Sort dialog boxটি screen-এ দেখা যাবে।

(iii) Sort dialog box-এর Sort by text box-এর drop down list থেকে sorting এর জন্য প্রথম column সিলেক্ট করতে হবে। Order-এর নীচের drop down list থেকে A to Z বা Z to A সিলেক্ট করতে হবে Ascending বা Descending Order-এ sorting করার জন্য।

(iv) এরপর Sort dialog box-এর Add Level বাটনে ক্লিক করতে হবে। এখানে Then by বক্সের drop down list থেকে দ্বিতীয় column এবং প্রয়োজনে আবার Add level বাটনে ক্লিক করে তৃতীয় Column সিলেক্ট করতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রে sorting order র জন্য A to Z বা Z to A এর সিলেক্ট করতে হবে।

(v) সবশেষে ok বাটনে ক্লিক করলে sorting সম্পূর্ণ হবে।

৪.৬. এক্সেল শীটে চার্ট এবং গ্রাফের ব্যবহার (Uses of Chart and Graph in Excel Sheet)

Excel Worksheet-এ বিভিন্ন ডাটা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে চার্ট বা গ্রাফ বলা হয়। Excel Sheet-এ এন্ট্রি করা ডাটা ব্যবহার করে খুব সহজেই sheet-এ চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা যায়। Excel Sheet-এ Pie, Bar, Column, Line, Area প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের Chart তৈরি করা যায়। Chart Option-এ বিভিন্ন ধরনের Chart ছবিসহ দেওয়া থাকে। এখানে ব্যবহারকারীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন ধরনের চার্ট তার ডাটার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত হবে। Excel-এ তৈরি চার্টের বিশেষ সুবিধা হল Worksheet এর ডাটায় কোনো পরিবর্তন হলে নতুন করে চার্ট তৈরি করতে হয় না। ডাটার পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার্টে প্রতিফলিত হয়। চার্টের বিভিন্ন অংশসমূহ নীচে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ডাটা সিরিজ (Data Series)— Excel worksheet এর Row বা Column-এ বিস্তৃত যে সংখ্যাগুলিকে চার্টে প্লট (Plot) করা হয় সেই সংখ্যাসমূহকে একত্রে ডাটা সিরিজ বলা হয়।

X অক্ষ (X-axis) — যে অনুভূমিক (Horizontal) লাইন বরাবর কোনো চার্টে বিভিন্ন ক্যাটেগরি (বিভিন্ন Column-এর নাম) প্রকাশ করা হয় তাকেই X-অক্ষ বলা হয়।

Y-অক্ষ (Y-axis) — যে লম্ব (Vertical) রেখা বরাবর কোনো চার্টে কোনো ডাটার মান প্রকাশ করা হয় তাকেই Y-অক্ষ বলা হয়।

লিজেন্ড (Legend) — লিজেন্ড হল কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন যার সাহায্যে কোনো ডাটা সিরিজ চার্ট কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক রকম ডাটাকে আলাদাভাবে বোঝানো যায়।

গ্রিডলাইনস (Gridlines) — চার্টে কিছু অনুভূমিক ও কিছু উল্লম্ব রেখা থাকে যা গ্রিড লাইন নামে পরিচিত। X-অক্ষ বা Y-অক্ষ থেকে কোনো ডাটার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রিডলাইনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চার্ট এরিয়া (Chart Area) — চার্টের চারদিকে যে Box অংশটি থাকে যার মধ্যে চার্টটি অবস্থিত তাকে চার্ট এরিয়া বলা হয়।

চার্ট টাইটেল (Chart Title) — প্রত্যেক চার্টের একটি টাইটেল থাকে যা থেকে চার্টটির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্লট এরিয়া (Plot Area) — চার্ট এরিয়ার ভেতরের যে অংশটিতে মূল চার্টটি থাকে তাকে প্লট এরিয়া বলে। প্লট এরিয়া থেকে ডাটাগুলির মান জানা যায়।

৪.৬.১ চার্ট তৈরি (Preparing Chart)

Excel 2007-এ চার্ট বা গ্রাফ তৈরির একাধিক পদ্ধতি আছে। Column Chart, Line Chart এবং Pie Chart তৈরীর পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

কলাম চার্ট তৈরি (Preparing Column Chart)

- যে ডাটা রেঞ্জের ওপর ভিত্তি করে Column Chart তৈরি করতে হবে Worksheet থেকে সেই ডাটা রেঞ্জ সিলেক্ট করতে হবে।
- Ribbon-এর Insert ট্যাবের Charts Command group-এর column বাটনে ক্লিক করতে হবে। বিভিন্ন column chart-এর চিত্রসহ তালিকা দেখা যাবে, যেমন 2D, 3D column cylinder, cone, pyramid ইত্যাদি। এর মধ্যে থেকে পছন্দমত লে-আউটে ক্লিক করতে হবে।
- সিলেক্ট করা ডাটা রেঞ্জের ওপর ভিত্তি করে তৈরি Column Chartটি Worksheet-এ দেখা যাবে।

নীচে চিত্রের মাধ্যমে কলাম চার্ট ইনসার্ট করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

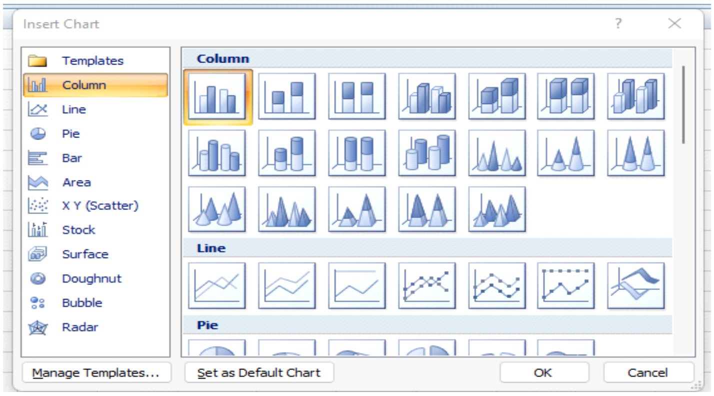

চিত্র ৪.৩ : কলাম চার্ট

লাইন চার্ট তৈরি (Preparing Line Chart)

- Line Chart তৈরির জন্য Worksheet থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা রেঞ্জ সিলেক্ট করতে হবে।
- এরপর Insert ট্যাবের Charts Command group-এর Line বাটনে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের Line Chart-এর তালিকা প্রদর্শিত হবে। যেমন 2D Line-এর অন্তর্গত Line, Stacked Line, 100% Stacked Line, Line With Markers এবং 3D Line ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট লে-আউটে ক্লিক করতে হবে।
- সিলেক্ট করা ডাটার ওপর ভিত্তি করে তৈরি Line Chartটি Worksheet-এ প্রদর্শিত হবে।

পাই চার্ট তৈরি (Preparing Pie Chart)

- যে ডাটার ভিত্তিতে Pie Chart তৈরি করতে হবে Worksheet থেকে সেই ডাটা রেঞ্জটি সিলেক্ট করতে হবে।
- এরপর Ribbon-এর Insert ট্যাবের Charts Command Group-এর Pie বাটনে ক্লিক করলে বিভিন্ন Pie Chart-এর লে-আউট

আসবে, যেমন 2D Pie-এর অন্তর্গত Pie, Exploded Pie, Pie of Pie এবং 3D Pie-এর অন্তর্গত Pie in 3D, Exploded Pie in 3D প্রভৃতি। পছন্দমত Pie লে-আউটে ক্লিক করতে হবে।

- সিলেক্ট করা ডাটা থেকে তৈরি Pie Chartটি Worksheet-এ দেখা যাবে।

নীচে চিত্রের সাহায্যে Pie চার্ট তৈরির পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

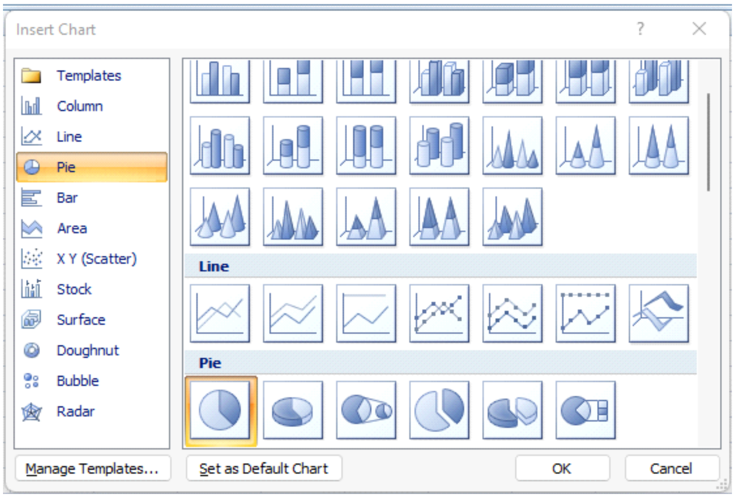

চিত্র ৪.৪ : পাই চার্ট

Worksheet-এ কোনো চার্ট বা গ্রাফ তৈরির পর Ribbon-এ Design, Layout এবং Format এই তিনটি অতিরিক্ত ট্যাবের সাহায্যে chart এর ডিজাইন, লেআউট এবং ফরম্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন করা যায়। নীচে এই Ribbon tab গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিজাইন ট্যাব (Design Tab)

এই ট্যাবে Type, Data, Chart, Layouts, Chart Style, Location নামক পাঁচটি command group থাকে। এই command group গুলিতে উপস্থিত বাটনগুলির সাহায্যে chart এর Type পরিবর্তন, ডাটা সিলেকশান (selection), chart-এর লে-আউট পরিবর্তন, chart এর style পরিবর্তন এবং chart এর Location পরিবর্তন (এক sheet থেকে অন্য sheet-এ chartটি স্থানান্তরিত করা) ইত্যাদি কাজগুলি করা যায়।

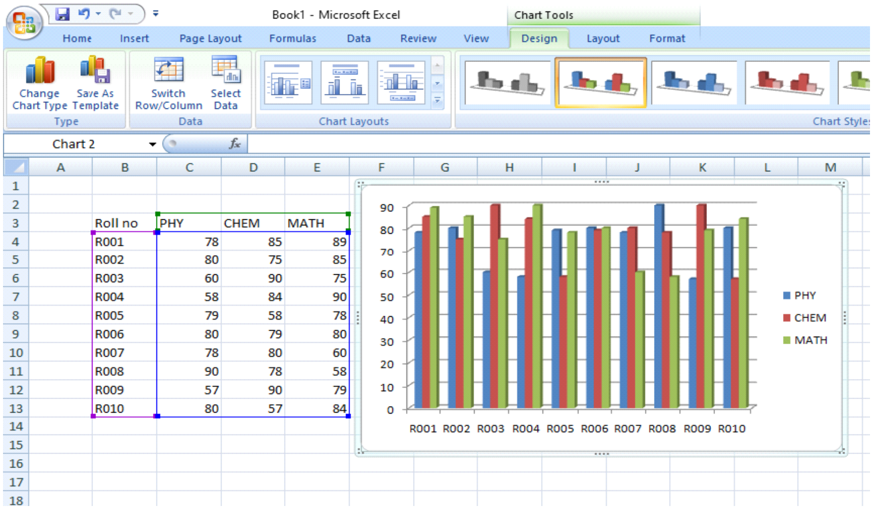

চিত্র ৪.৫ : ডিজাইন ট্যাব

লেআউট ট্যাব (Layout Tab)

এই Ribbon ট্যাবে যে Command group গুলি থাকে সেগুলি হল current selection, Insert, Labels, Axes, Background, Analysis এবং Properties। Command group-এ উপস্থিত এই বাটনগুলির সাহায্যে chart-এর বিভিন্ন অংশ, যেমন Chart Area, Chart Title, Legend, Plot Area ইত্যাদি সিলেক্ট করা, chart-এর জন্য প্রয়োজনীয় Picture, Auto Shapes, Text Box insert করা, chart-এর Labels গুলি ঠিক করা ইত্যাদি কাজগুলি করা যায়।

ফরম্যাট ট্যাব (Format Tab)

এই Ribbon ট্যাবে Current Selection, Shape Styles, Word Art, Arrange, Size মোট পাঁচটি Command group থাকে। এই বাটনগুলির সাহায্যে Chart-এর বিভিন্ন অংশ যেমন Chart Area, Chart Title, Plot Area, Legend ইত্যাদি অংশগুলিতে বিভিন্ন color দেওয়া, Line colour করা, Shadow Effects যুক্ত করা, Chart-এর Shape Style পরিবর্তন করা ইত্যাদি কাজগুলি করা যায়।

৪.৭ ওয়ার্কশীট প্রিন্ট করা (Printing Worksheet)

কোনো ওয়ার্কশীট প্রিন্ট করার আগে পেজটিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে নিতে (যেমন-পেজ-সাইজ, মার্জিন, Orientation, Header, Footer ইত্যাদি) হবে। Page Layout tab থেকে page setup-এ ক্লিক করলে Page-Setup ডায়ালগ বক্স খুলে যাবে। এই Page setup dialog box এর বিভিন্ন ট্যাব সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

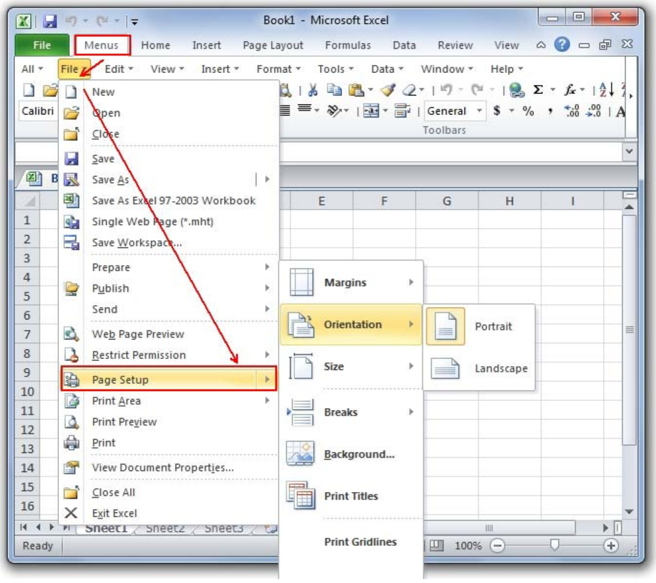

চিত্র ৪.৬ : পেজ সেটআপ

পেজ ট্যাব (Page Tab)

- Orientation এরিয়া থেকে পেজটি কীভাবে প্রিন্ট Print হবে, যেমন—Portrait না Landscape তা সিলেক্ট করতে হবে।
- Paper size ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে প্রয়োজনীয় পেপার সাইজ (যেমন-A4, A3, Legal ইত্যাদি) সিলেক্ট করতে হবে।
- Print Quality ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে সঠিক রেজুলেশন (dots per inch) সিলেক্ট করতে হবে।
- First Page number box-এ প্রথম পেজ নম্বর 1 থেকে শুরু না হয়ে অন্য কোনো সংখ্যা থেকে শুরু করতে চাইলে সেই সংখ্যাটি টাইপ করতে হবে।

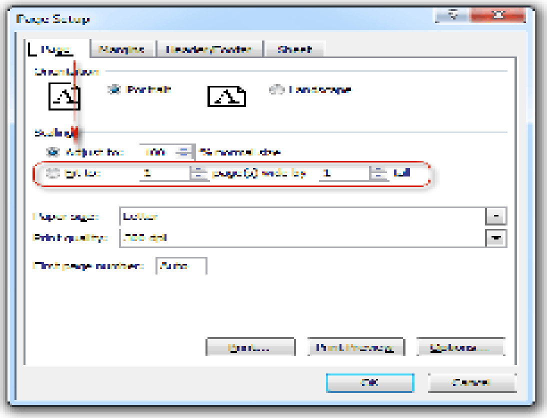

চিত্র ৪.৭ :পেজ ট্যাব

মার্জিন ট্যাব (Margins Tab)

Page setup ডায়ালগ বক্সের Margins ট্যাব-এ ক্লিক করলে এই ট্যাবটি খুলে যাবে।

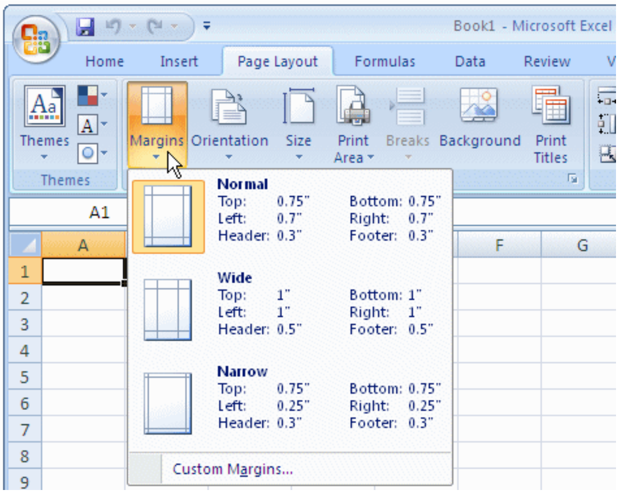

চিত্র ৪.৮ : মার্জিন ট্যাব

Top, Bottom, Left, Right বক্স থেকে পেজের যথাক্রমে উপরে, নীচে, বামদিকে ও ডানদিকে কতটা মার্জিন ছাড়তে হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

হেডার/ফুটার ট্যাব (Header/Footer Tab)

কোনো পেজের Header ও Footer সেট করতে হলে Header/Footer Tab-এ ক্লিক করতে হবে।

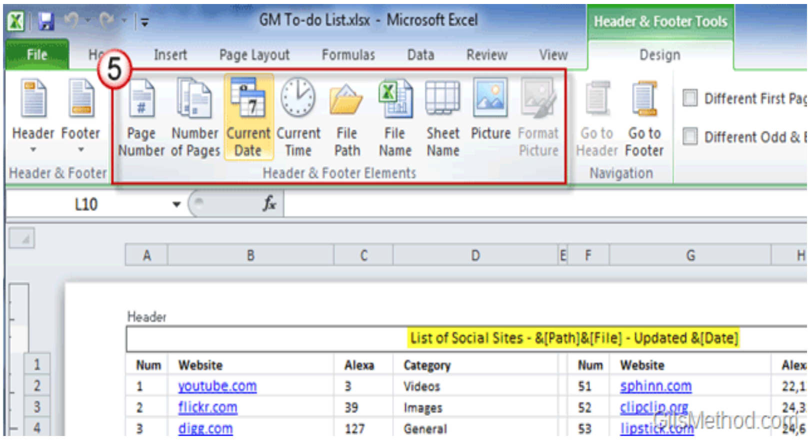

চিত্র ৪.৯ : হেডার/ফুটার ট্যাব

নিজের ইচ্ছামত নতুন Header/Footer তৈরি করতে হলে যথাক্রমে Custom Header বা Custom Footer বোতামে ক্লিক করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি নতুন dialog box খুলে যাবে যেখানে প্রয়োজনীয় টেক্স এন্ট্রি করতে হবে। এখানে ওই টেক্সটি Format করা যাবে এবং Page number, total number of page, date, time ইত্যাদি Header বা Footer-এ লেখা যাবে।

শীট ট্যাব (Sheet Tab)

এই ট্যাপের অপশনগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

Print Area : এই বক্সে ক্লিক করে একটি ওয়ার্কশিটের কতটুকু অংশ প্রিন্ট হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়।

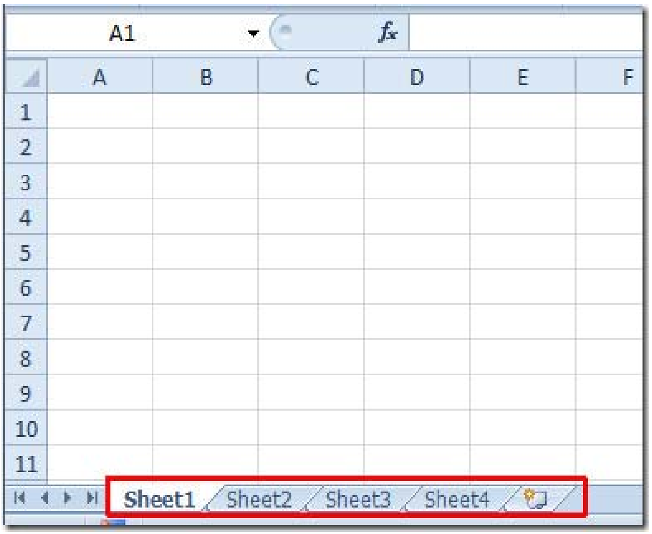

চিত্র ৪.১০ : শীট ট্যাব

Rows to repeat at top : এই বক্সে ক্লিক করে কোন কোন রো প্রত্যেক পেজেই প্রিন্ট হবে তা সিলেক্ট করা হয়।

Columns to repeat at left : এই বক্সে ক্লিক করে কোন কোন কলাম প্রত্যেক পেজের বামদিকে প্রিন্ট হবে তা সিলেক্ট করা হয়।

Gridlines : এই বক্সটি সিলেক্ট করলে প্রত্যেক পেজে Gridlines প্রিন্ট হবে।

প্রিন্ট প্রিভিউ (Print Preview)

Page Setup এর কাজ শেষ হলে Worksheet টি প্রিন্ট হবার পর দেখতে কেমন লাগবে তা প্রিন্ট প্রিভিউ-এর মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। প্রিন্ট প্রিভিউ দেখতে হলে Page Setup ডায়ালগ বক্সের Print Preview বোতামে ক্লিক করতে হবে অথবা Microsoft Office Button-এ Click করে Print Preview সিলেক্ট করতে হবে অথবা কী বোর্ড থেকে Ctrl+F2 প্রেস করতে হবে।

প্রিন্ট

কোনো ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করতে হলে Microsoft Office Button-এ Click করে Print সিলেক্ট করতে হবে অথবা কী বোর্ড থেকে Ctrl+P প্রেস করতে হবে। এরপর Print ডায়ালগ বক্স খুলে যাবে। প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সের অপশনগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

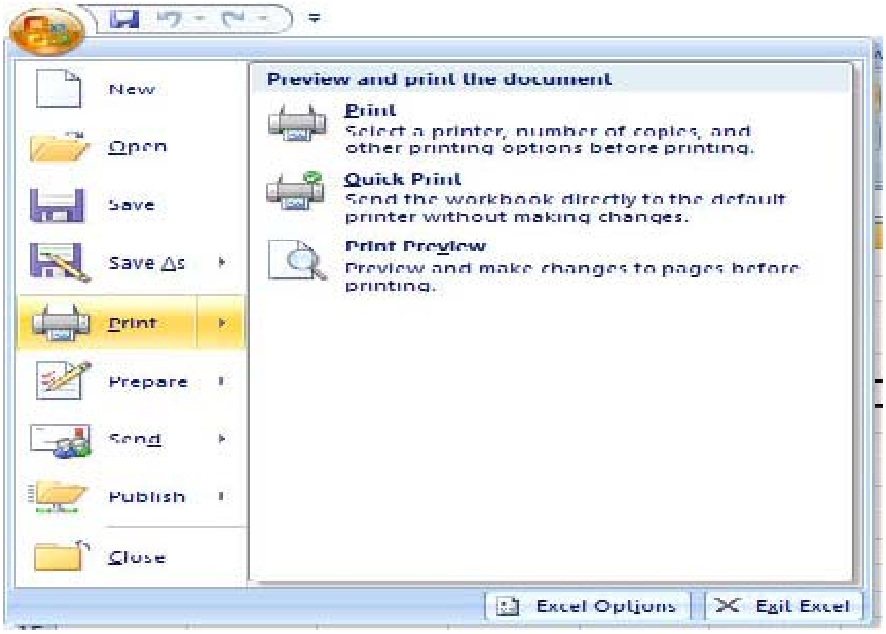

চিত্র ৪.১১ : প্রিন্ট ডায়ালগ বক্স

Name : এই বক্স থেকে যে প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে হবে তার নাম সিলেক্ট করতে হবে।

Print Range : এই অপশনটি থেকে কোন কোন পেজ প্রিন্ট হবে তা সিলেক্ট করতে হবে।

Print What : এই বক্স থেকে কী প্রিন্ট করতে হবে তা স্থির করা হয়। সিলেক্ট করা অংশ প্রিন্ট করতে হলে Selection, active শিটগুলো প্রিন্ট করতে হলে Active Sheets এবং সমগ্র ওয়ার্কবুকটি প্রিন্ট করতে হলে Entire Workbook অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

৪.৮ Ms-Excel-এ ফর্মুলার ব্যবহার (Use of Formula in Ms-Excel)

Ms-Excel-এর একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হল বিভিন্ন গাণিতিক ফরমুলা ব্যবহার করে গণনা করা। একটি ফর্মুলা worksheet-এর দুই বা তার অধিক সেলের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। নীচে ফর্মুলা ব্যবহার করে গণনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সেলে ফর্মূলা ইনসার্ট করা (Inserting Formula in Cell)

কোনো একটি cell-এ formula ইনসার্ট করার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(i) যে সেলে ফর্মূলা ইনসার্ট করতে হবে সেই সেলের ওপর click করে Cell-টি সিলেক্ট করতে হবে।

(ii) '=' চিহ্ন টাইপ করতে হবে।

(iii) '='-এরপর ফর্মূলা এন্ট্রি করতে হবে।

(iv) সবশেষে Enter key প্রেস করতে হবে।

কোনো সেলে গিয়ে সরাসরি কোনো ফর্মূলা টাইপ করার পরিবর্তে, ফর্মূলা বারে গিয়ে ফর্মূলা টাইপ করা যেতে পারে। ফর্মূলা টাইপ করা হয়ে গেলে enter key প্রেস করলে ফর্মূলার ফলাফল, সিলেক্ট করা cell-এ প্রদর্শিত হবে। নীচে চিত্রের সাহায্যে ফর্মূলা ইনসার্ট ও কপি করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

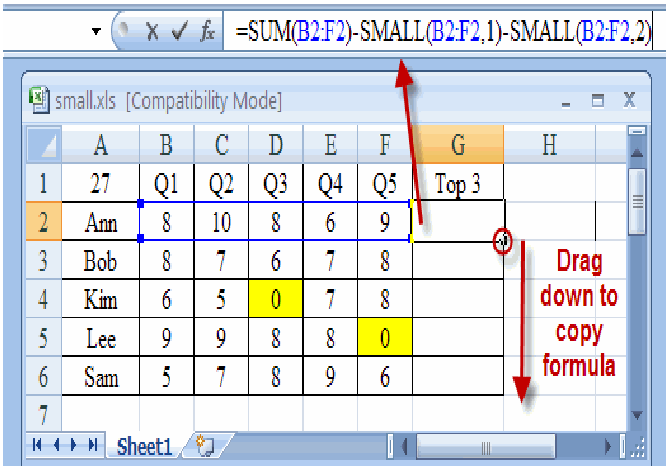

চিত্র ৪.১২ : ফরমূলা ইনসার্ট করা

MS-Excel-এ ফর্মূলা ব্যবহার করে কীভাবে নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদন করা যায় তার একটি উদাহরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণ : A1 থেকে A5 cell গুলিতে থাকা সংখ্যাগুলির Average নির্ধারণ করা।

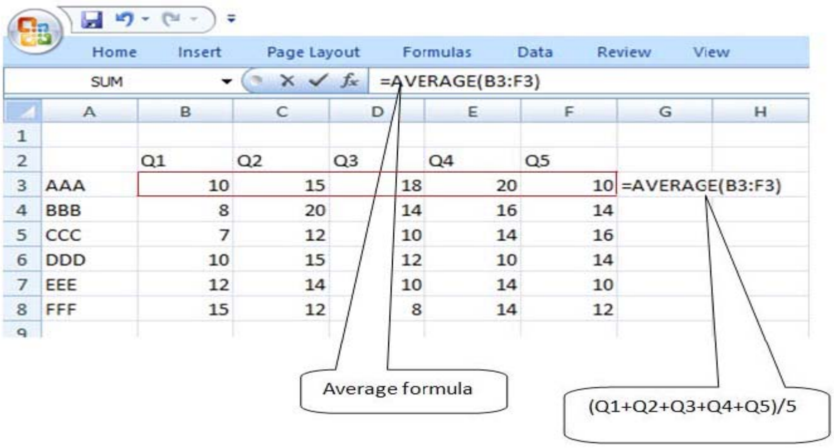

চিত্র ৪.১৩ : সংখ্যাসমূহের গড় নির্ধারণ

উপরিউক্ত কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(i) সেল A6 সিলেক্ট করা যেতে পারে ফলাফল ডিসপ্লে করার জন্য।

(ii) = Average (A1 : A5) টাইপ করতে হবে।

(iii) Enter key প্রেস করতে হবে।

Cell A6-এ সংখ্যাগুলির average বা গড় প্রদর্শিত হবে।

৪.৯ MS-Excel-এর কার্যসমূহ (Functions of MS-Excel)

MS-Excel-এ যে সমস্ত function গুলি আছে সেগুলির সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমে Formula tab সিলেক্ট করতে হবে। এরপর Insert function button-এ click করতে হবে, তাহলে Insert Function এর dialog box প্রদর্শিত হবে।

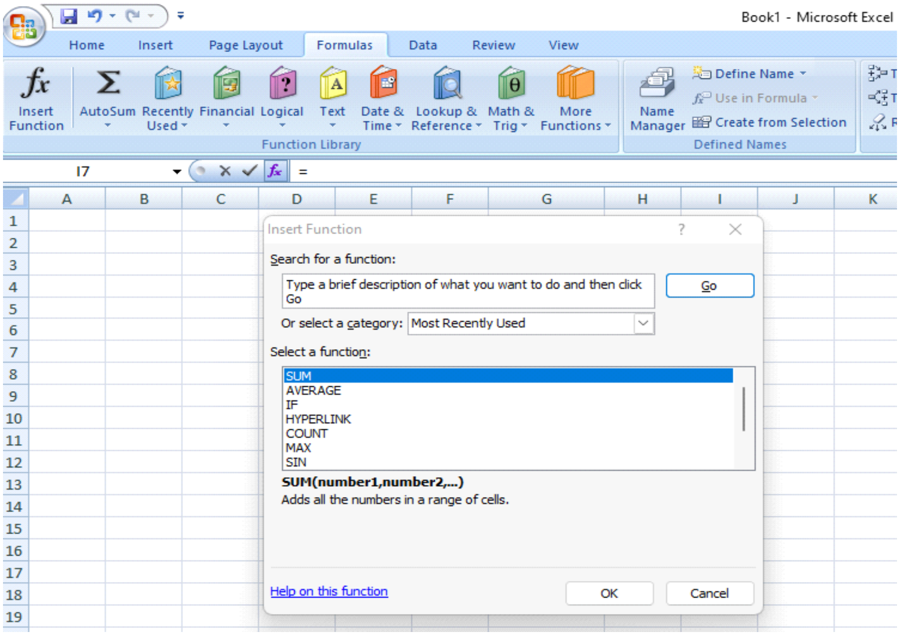

চিত্র ৪.১৪ : এক্সেলের কার্যসমূহ

এই Box-এ Category অনুযায়ী excel function গুলিকে পাওয়া যাবে এবং ব্যবহার করা যাবে। Excel এ অনেক ধরনের Mathematical এবং Statistical function আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য function নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

Abs (Number)— এই function টি parameter হিসাবে ব্যবহৃত সংখ্যাটির Absolute Positive Value নির্ণয় করে।

উদাহরণ : Abs (20) return করে 20

Abs (–20) return করে 20

Int (Number)— এই function টি parameter হিসাবে ব্যবহৃত সংখ্যাটির nearest integer এ round up করে।

উদাহরণ : Int (5·3) return করে 5

Int (6·8) return করে 7

Mod (Number, divisor)— এই function টি ভাজক (divisor) দ্বারা সংখ্যাটিকে ভাগ করার পর ভাগশেষ (Remainder) return করে।

উদাহরণ : Mod (89, 10) return করে 9

Sqrt (Number)— এই function টি argument হিসাবে ব্যবহৃত সংখ্যাটির square root বা বর্গমূল নির্ণয় করে।

উদাহরণ : sqrt (25) return করে 5

Sum (Number 1, Number 2,...) : এই function টি সংখ্যাগুলির যোগফল প্রদান করে।

উদাহরণ : Sum (20, 30, 50) return করে 100

Average (Number 1, Number 2,...)— এই function টি সংখ্যাগুলির গড় বা average নির্ণয় করে।

উদাহরণ : Average (10, 20, 30) return করে 20

Max (Number 1, Number 2,...)— এই function টি সংখ্যাগুলির মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটিকে return করে।

উদাহরণ : Max (50, 120, 70) return করে 120

Min (Number 1, Number 2,...)— এই function টি সংখ্যাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিকে return করে।

উদাহরণ : Min (50, 120, 70) return করে 50

Autosum এর ব্যবহার

কতকগুলি সংখ্যার যোগফল খুব সহজে ও দ্রুত নির্ণয় করতে Autosum button খুবই কার্যকরী।

(i) যে সেলে যোগফল নির্ণয় করতে হবে প্রথমে সেই সেলে ক্লিক করতে হবে।

(ii) Home Tab থেকে Auto Sum button-এ click করতে হবে।

(iii) যে সেলগুলির যোগফল নির্ণয় করতে হবে তাদের সিলেক্ট করতে হবে।

(iv) পুনরায় Auto Sum button-এ click করলে যোগফল সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হবে।

সারসংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ে একটি বহুল ব্যবহৃত স্প্রেডশীট প্যাকেজ যার নাম হল MS-Excel, সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- MS-Excel হল MS-Office এর একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল যার সাহায্যে যেকোনো গাণিতিক হিসাব সম্বন্ধীয় কাজ, চার্ট প্রস্তুত করা ইত্যাদি খুব সহজে এবং দ্রুত করা যায়।
- একটি Excel File কে Workbook বলে যা একাধিক Worksheet এর সমন্বয়ে গঠিত। একটি Excel File-এর extension. xlsx। স্ক্রীনে ওয়ার্কশীটের যে অংশটুকু দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্কশীট তার থেকে অনেক বড়ো। এক একটি ওয়ার্কশীট অনেকগুলি Row এবং Column এর সমন্বয়ে গঠিত। একটি রো ও একটি কলাম যেখানে সংযুক্ত হয় তাকে Cell বলা হয়। এই সেলে ডাটা এন্ট্রি করা হয়। কলাম ও রো এর নাম অনুযায়ী সেলের নামকরণ করা হয়। Cell-এ কোনো তথ্য টাইপ করে Enter প্রেস করলে ওই তথ্য সেলে স্টোর হয়।
- Excel Worksheetর Row ও Column width মাউসের সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়। এখানে Copy এবং Paste পদ্ধতি MS-Word এর মতো হলেও সামান্য পার্থক্য আছে।
- Excel Worksheet-এ চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। এই চার্ট বা গ্রাফ এডিট করা যায় এবং কপি করে তা অন্য ফাইলে নির্দিষ্ট স্থানে পেস্টও করা যায়।
- Excel এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল গণিত ও রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে দীর্ঘ ও জটিল সমস্যার সমাধান করা। এছাড়া বিভিন্ন গাণিতিক ফর্মুলা প্রস্তুত করার জন্য এক্সেল ব্যবহার করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

MS-Excel, Spreadsheet, Cell, Cell Address, Autosum, Autofill, Autocomplete, Worksheet, Workbook.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) MS-Excel বলতে কী বোঝ? কী কী কাজে MS-Excel ব্যবহার করা যায়?

(২) একটি ওয়ার্কশীটে তথ্য সংযোজন করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৩) MS-Excel-এ কীভাবে একটি Pie Chart আঁকা যায় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(৪) Excel-এ Auto complete বলতে কী বোঝায়?

(৫) Formula Bar এর কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৬) Excel-এ কোনো Cell এর Content কীভাবে Delete করা যায়?

(৭) Excel-এ যে সমস্ত ফর্মূলা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে যেকোনো চারটি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

(৮) Spreadsheet বলতে কী বোঝায়?

(৯) একটি Excel ওয়ার্ক শীটে Row এবং Column-এর সংখ্যা লেখো।

(১০) Name Box এর কাজ কী?

(১১) C37 বলতে কী বোঝায়?

(১২) Drag এবং Drop পদ্ধতিতে কীভাবে কপি করা যায়?

(১৩) একটি Worksheet-এ কীভাবে নতুন Column সংযোজন করা যায়?

(১৪) একটি Worksheet কীভাবে 5টি নতুন Row insert করা যায়?

(১৫) চার্ট বলতে কী বোঝো?

(১৬) একটি Excel Chart এর বিভিন্ন অংশগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(১৭) একটি Column Chart আঁকার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(১৮) একটি Excel worksheet কীভাবে প্রিন্ট করা যায়?

(১৯) Autosum কী?

(২০) কীভাবে ফর্মূলার সাহায্যে কতগুলি সংখ্যার গড় নির্ণয় করা যায় ব্যাখ্যা কর।

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) নির্দেশ মতো কাজগুলি কর।

(ক) A1, A2 এবং A3 সেলে তিনটি পৃথক Word লেখো।

(খ) B1, B2 এবং B3 সেলে তিনটি Number লেখো।

(গ) B4 Cell-এ click করে উপরের সংখ্যাগুলির যোগফল Autosum-এর দ্বারা নির্ণয় করো।

(ঘ) Column এবং Row এর যথাক্রমে width ও height পরিবর্তন করো।

(২) নীচের Tabulation Sheet টি তৈরি কর উপযুক্ত Excel Function এর সাহায্যে।

Roll	Name	Marks							Total	% of Marks	Grade	Rank
		Language 1	Language 2	Math	Science	History	Geography	EVS				
1												
2												
...												
10												

N.B. Total = Language 1 + Language 2 + Math + Science + History + Geography + EVS

% of Marks = Total/7

Grade = A (% of Marks >= 90)

= B (% of Marks >= 70 but <90)

= C (% of Marks >= 50 but <70)

= D (% of Marks >= 40 but <50)

E (% of Marks <40)

(৩) উপরের টেবিলের ডাটা ব্যবহার করে একটি বার চার্ট তৈরি কর।

অধ্যায়

৫

শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে পাওয়ার পয়েন্ট

৫.১ সূচনা (Introduction)

মাইক্রোসফ্‌ট অফিসের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ার গুলির মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট একটি অন্যতম সফটওয়ার। কোনো বিষয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট অত্যন্ত কার্যকরী। এর জন্য একে প্রেজেন্টেশন সফটওয়ারও বলা হয়। এই সফটওয়ারের মধ্যে প্রয়োজনীয় ছবি, গ্রাফ, চার্ট, শব্দ, গতি, রং ইত্যাদি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে দর্শকের কাছে উপস্থাপন করা যায়। পাওয়ার পয়েন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে কোনো স্তরেই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব। প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত এমনকি গবেষণাস্তরেও পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার সমানভাবে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহারে যে সুবিধাগুলি আছে সেগুলি হল–

- পাওয়ার পয়েন্ট দ্বারা তৈরি প্রেজেন্টশনকে বিভিন্ন মাধ্যম; যেমন— কম্পিউটার স্ক্রিন, প্রোজেক্টর, এল.সি.ডি বা এল.ই.ডি টিভি, ডিজিটাল স্ক্রিন ইত্যাদিতে প্রদর্শন করা যায়।
- পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে তৈরি প্রেজেন্টেশনে ব্যবহৃত স্লাইডগুলি প্রিন্ট করা সম্ভব।
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনকে সহজেই সংশোধন বা আপডেট করা যায়।
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের স্লাইডে সরাসরি অডিও এবং ভিডিও ক্লিপ যোগ করা সম্ভব।

এই অধ্যায়টি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে ঃ

- পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে কী করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায় তা জানা যাবে।
- পাওয়ার পয়েন্টের বিভিন্ন উইজার্ডের ব্যবহার জানা যাবে।
- পাওয়ার পয়েন্টে ছবি, গ্রাফ, নকশা ইত্যাদি যুক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।
- স্লাইডে শব্দ, অ্যানিমেশন যুক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে।
- স্লাইড প্রিন্ট করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।
- পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যায় সেই সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।

৫.২ পাওয়ার পয়েন্টের প্রাথমিক ধারণাসমূহ (Basic Concepts of Power Point)

MS-Office package-এর একটি অন্যতম অংশ হল MS-Power Point। পাওয়ার পয়েন্টের ফাইলটিকে প্রেজেন্টেশন বলা হয়। একটি ফাইলে যেমন অনেকগুলো পৃষ্ঠা থাকতে পারে তেমনি পাওয়ার পয়েন্টের একটি প্রেজেন্টেশনে অনেকগুলো স্লাইড থাকতে পারে। এছাড়াও—হ্যান্ড আউট, স্পিকার নোট, আউটলাইন ইত্যাদি প্রেজেন্টেশনে থাকতে পারে। পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে Video Slide show, Web presentationও করা সম্ভব। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২.১ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপনা (Presentation through Power Point)

পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে কোনো প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করতে হলে সেটি সাধারণত এক বা একাধিক স্লাইড সহযোগে তৈরি হয়। Power Point খুলতে হলে প্রথমে Desktop থেকে Start → All programs →Microsoft office → Microsoft Power Point ক্লিক করলেই Power Point খুলে যাবে। নীচে Power Point—এর Window—টির একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে।

দুটি ভিন্ন উপায়ে পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে প্রেজেন্টশন তৈরি করা যেতে পারে। প্রথমটি হল Design template—এর সাহায্যে এবং দ্বিতীয়টি হল Blank Presentation ব্যবহার করে। নীচে এইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নকশা ছাঁচের সাহায্যে নতুন উপস্থাপনা সৃষ্টি (Creating New Presentation with Design Template)

এই পদ্ধতিতে প্রেজেন্টশন বানানোর জন্য প্রথমে Power Point—এর office Button—এ ক্লিক করতে হবে। সেখানে New Option এ ক্লিক করলে New presentation ডায়লগ বক্স খুলে যাবে। এরপর Installed Template Option—এ ক্লিক করলে নীচের চিত্রটি দেখা যাবে। সেখানে ব্যবহারকারী তার নিজের পছন্দ অনুসারে Template নির্বাচন করে Create Button এ ক্লিক করলে সেই template—টি খুলে যাবে। এক্ষেত্রে প্রোজেক্টটিতে অনেকগুলি slide থাকবে এবং ব্যবহারকারী তার পছন্দ মতো Edit করে নিতে পারবে।

ফাঁকা বা শূন্য উপস্থাপনার সাহায্যে নতুন উপস্থাপনা সৃষ্টি (Creating New Presentation with Blank Presentation)

এই পদ্ধতিতে Power Point এর office Button-এ ক্লিক করে প্রথমে New option ক্লিক করলে New Presentation খুলে যাবে। সেখানে Blank এবং Recent Option-এ ক্লিক করলে Blank Presentation এর Option পাওয়া যাবে। এরপর Blank Presentation র Optionটি নির্বাচন করে Create Button এ ক্লিক করলে একটি Blank Presentation তৈরি হবে এবং এই উইন্ডো স্ক্রিনটি পুরোপুরি ফাঁকা থাকে। ব্যবহারকারী তার পছন্দমতো ডিজাইন ব্যবহার করে নতুন প্রোজেন্টশন তৈরি করতে পারে।

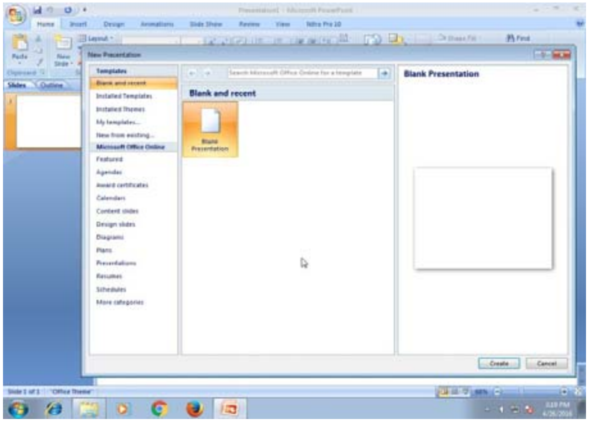

চিত্র ৫.১ : পাওয়ার পয়েন্ট উইন্ডো

মাইক্রোসফট্ পাওয়ার পয়েন্ট ২০০৭-এর বিভিন্ন রিবন ট্যাবগুলি হলো হোম রিবন ট্যাব, ইনসার্ট রিবন ট্যাব, ডিজাইন রিবন ট্যাব, অ্যানিমেশন রিবন ট্যাব, ট্রানজিসান রিবন ট্যাব এবং স্লাইড সো রিবন ট্যাব। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হোম রিবন ট্যাব- Cut, Copy, Paste, Font Size, Bold, Italic, Underline ইত্যাদি কমান্ড দ্বারা এই রিবন ট্যাব গঠিত হয়। এছাড়াও ক্লিপবোর্ড, স্লাইড, ফন্ট, প্যারাগ্রাফ, ড্রইং এবং এডিটিং কমান্ড গ্রুপ এই হোম রিবন ট্যাবের অন্তর্গত।

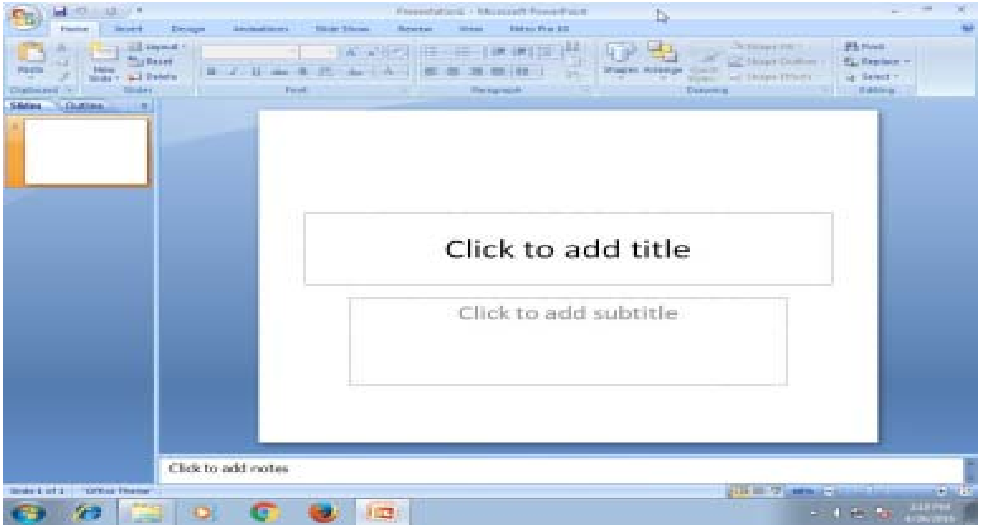

চিত্র ৫.২ : হোম রিবন ট্যাব

স্লাইড কমান্ড গ্রুপ - এই কমান্ড গ্রুপের মধ্যে থাকে New Slide ড্রপ ডাউন মেনু, Slide Layout ড্রপ ডাউন মেনু, Reset অপশন, Delete অপশন, Section ড্রপডাউন মেনু ইত্যাদি। নিম্নে স্লাইড কমান্ডগুলোর একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে।

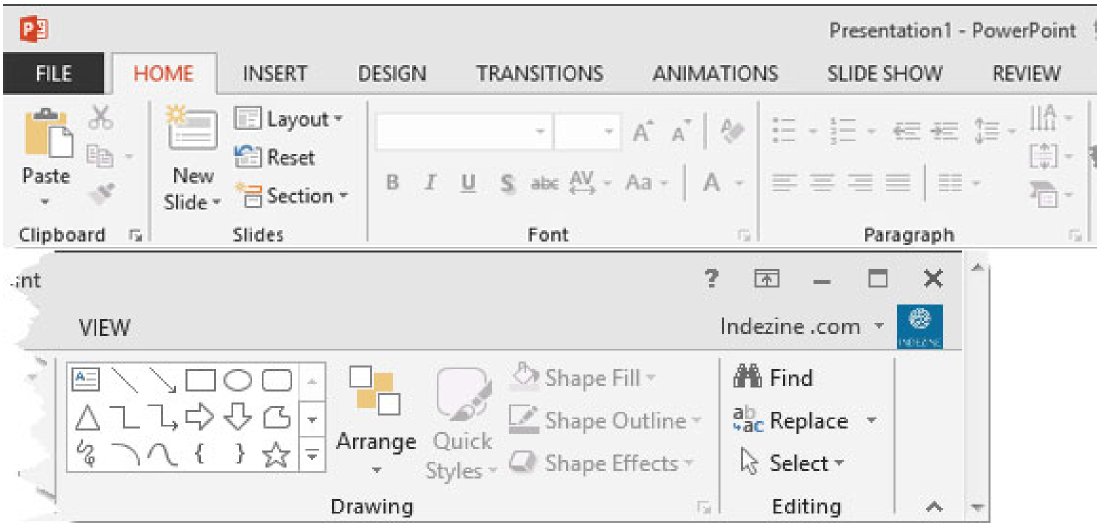

চিত্র ৫.৩ : স্লাইড কমান্ড গ্রুপ

ইনসার্ট রিবন ট্যাব - এই রিবন ট্যাবের মধ্যে থাকে Table, Image, Illustration, Line, Text, Symbol এবং Media-clips ইত্যাদি কমান্ড গ্রুপ। এই রিবণ ট্যাবের মাধ্যমে ব্যবহারকারী Table, Picture, Clipart, Photoalbum, Shape, Chart, Text Box, Header and Footer, Word Art, Date & Time, Slide Number, Symbol, Object, Movie Sound ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রেজেন্টশনে ব্যবহার করতে পারে।

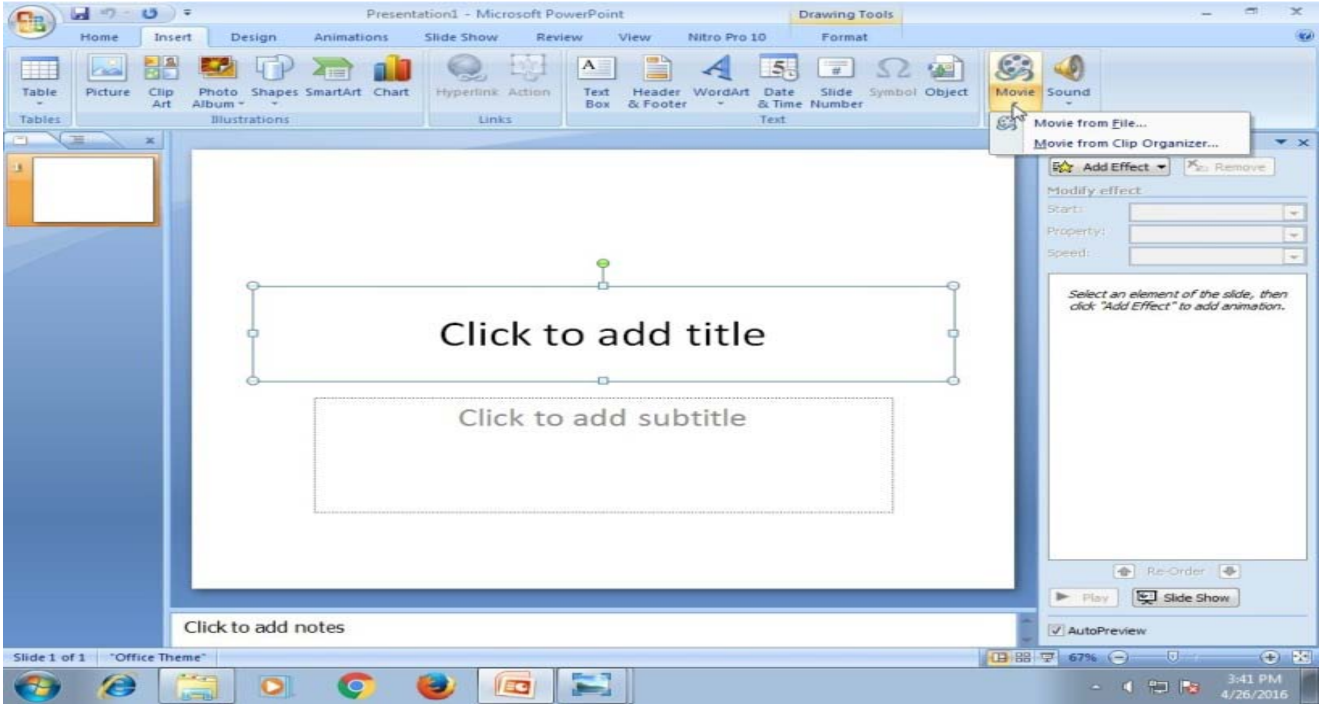

চিত্র ৫.৪ : ইনসার্ট ট্যাব

ডিজাইন রিবন ট্যাব - এই রিবন ট্যাবের মধ্যে তিনটি কমান্ড গ্রুপ থাকে; যেমন—Page Setup, Theme,এবং Background। নীচে ডিজাইন রিবন ট্যাব চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

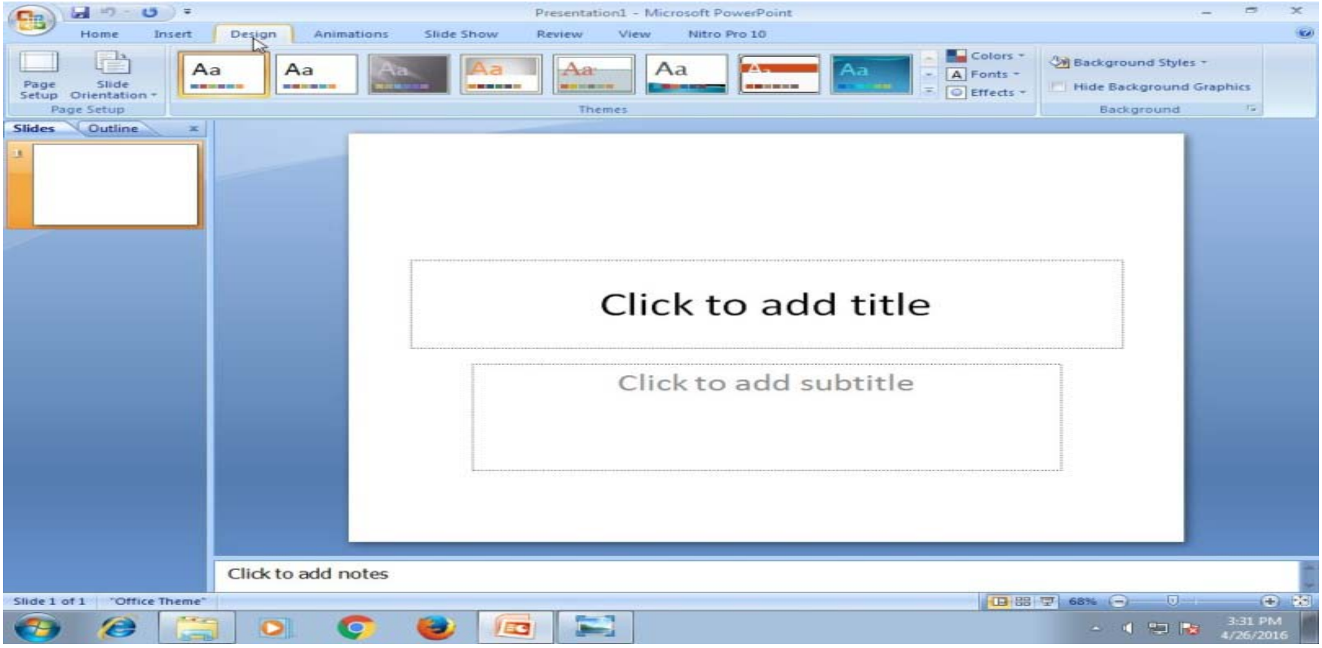

চিত্র ৫.৫ : ডিজাইন রিবন ট্যাব

অ্যানিমেশন রিবন ট্যাব - এই রিবন ট্যাবের মাধ্যমে পূর্বে তৈরি করা Slide-গুলির মধ্যে যেসকল Wordart, Picture, Drawing, Clipart, Text ইত্যাদি যুক্ত করা আছে, সেগুলিকে অ্যানিমেশন রিবনের মধ্যে অবস্থিত কমান্ড গ্রুপ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন স্লাইডের মধ্যে অবস্থিত অ্যানিমেশন ট্যাবের Preset বা Custom অ্যানিমেশন যুক্ত করে স্লাইডগুলির বিভিন্ন ডিজাইনের অ্যানিমেশন তৈরি করা যায়। অ্যানিমেশন রিবন ট্যাবের তিনটি কমান্ড গ্রুপ থাকে; যেমন—Preview কমান্ড গ্রুপ, অ্যানিমেশন কমান্ড গ্রুপ এবং Timing কমান্ড গ্রুপ। নিম্নে এগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

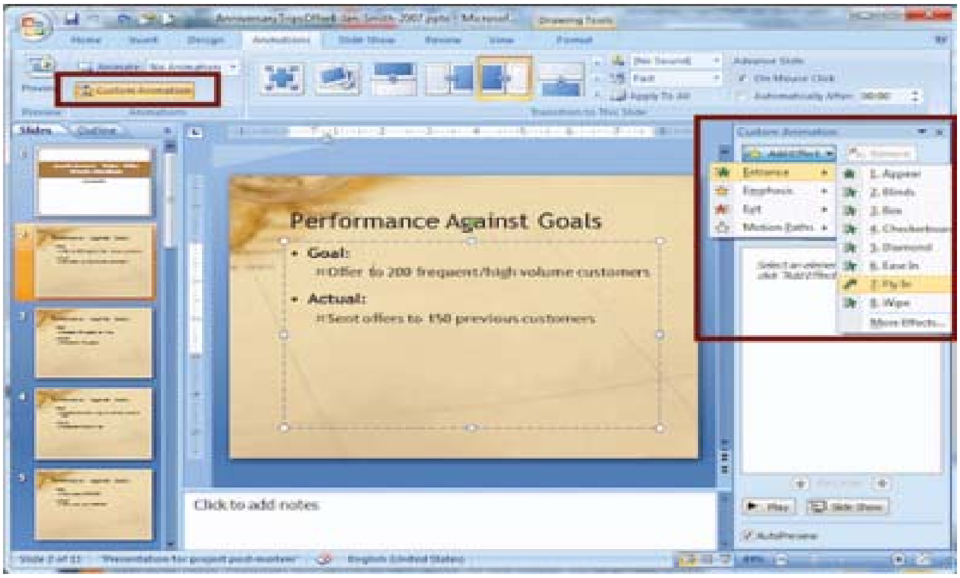

চিত্র ৫.৬ : অ্যানিমেশন রিবন ট্যাব

(ক) প্রিভিউ (Preview) কমান্ড গ্রুপ — এই কমান্ড গ্রুপের দ্বারা স্লাইডগুলিতে যুক্ত হওয়া অ্যানিমেশন স্লাইড স্টার্ট হওয়ার পূর্বেই দেখা যায়।

(খ) অ্যানিমেশন (Animation) কমান্ড গ্রুপ — এই কমান্ড গ্রুপে দুটি টুল থাকে, প্রিসেট অ্যানিমেশন টুল এবং কাস্টমস্ অ্যানিমেশন টুল। কাস্টমস্ অ্যানিমেশন টুল বক্স-এ ক্লিক করলে একটি Task Panel আসবে। ঐ Task Panel এর মধ্যে অবস্থিত Add Effect বাটন থেকে বিভিন্ন অ্যানিমেশনগুলি পাওয়া যায়, যেখান থেকে ব্যবহারকারী নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী অ্যানিমেশন Slide-এর বিভিন্ন কার্যের সহিত যুক্ত করতে পারে।

(গ) টাইমিং (Timing) কমান্ড গ্রুপ - এই কমান্ড গ্রুপের দ্বারা Slideগুলির মধ্যে যুক্ত করা অ্যানিমেশনগুলি সময়সীমা, স্থায়ীকাল, শুরু হওয়া সময় এবং কোনটি আগে হবে, কোনটি পরে হবে তা ব্যবহারকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী স্থির করা যায়।

ট্রান্‌জিশন রিবন ট্যাব - এই রিবন ট্যাবের মধ্যে তিনটি কমান্ড গ্রুপ থাকে—প্রিভিউ (Preview), স্লাইড ট্রানজিশান (Slide Transition) এবং টাইমিং (Timing)। নীচে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৫.৭ : ট্রান্‌জিশন রিবন ট্যাব

(ক) প্রিভিউ (Preview) কমান্ড গ্রুপ - এই কমান্ড গ্রুপ দ্বারা স্লাইড সো-এর পূর্বেই Slideগুলির মধ্যে যুক্ত হওয়া অ্যানিমেশন এবং ট্রানজিশনগুলি দেখা যায়।

(খ) স্লাইড ট্রানজিশন (Slide Transition) কমান্ড গ্রুপ — এই কমান্ড গ্রুপের মধ্যে থাকে Split, Cut, Wipe এবং Effect অপশন।

(গ) টাইমিং (Timing) কমান্ড গ্রুপ — ট্রানজিশান রিবন ট্যাবের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড গ্রুপ হলো টাইমিং কমান্ড গ্রুপ। এর মধ্যে থাকে সাউন্ড। এই কমান্ড গ্রুপের সাহায্যে দুটি স্লাইড এর মধ্যবর্তী সময়কাল, স্লাইডগুলির পরপর অটোমেটিক ডিসপ্লে, স্লাইডগুলিকে মাউসের ক্লিকের মাধ্যমে দেখানোর পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যগুলি সম্পন্ন করা যায়।

স্লাইড শো (Slide Show) রিবন ট্যাব — এই ট্যাবের প্রধানত তিনটি কমান্ড গ্রুপ থাকে; যথা — Start Slide Show, Set Up এবং Monitor (মনিটর)। নীচে এগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

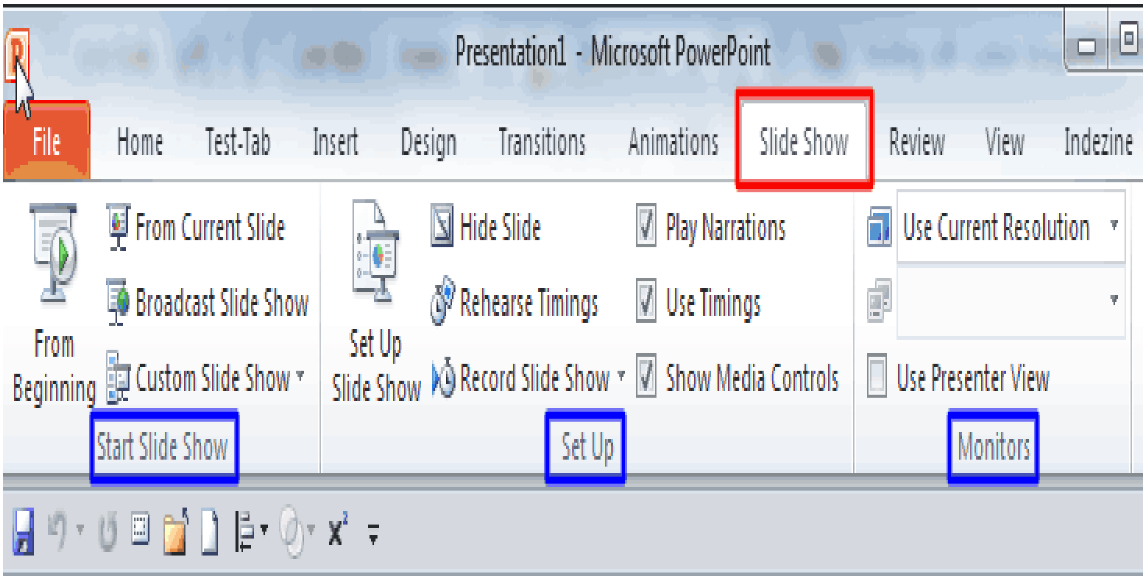

চিত্র ৫.৮ : স্লাইড শো রিবন ট্যাব

(ক) স্টার্ট স্লাইড শো (Start Slide Show) কমান্ড গ্রুপ - এই কমান্ড গ্রুপের মধ্যে চারটি অপশন বর্তমান। যেমন From begining, From current slide, Broad cast slide show এবং Custom slide show। From begining অপশনে ক্লিক করলে স্লাইডগুলি একদম প্রথম থেকে প্রদর্শিত হবে এবং From Current Slide অপশনে ক্লিক করলে বর্তমানে মাউস পয়েন্টারটি যে স্লাইডে আছে স্লাইডগুলি সেই স্লাইড থেকেই প্রদর্শিত হবে। Custom Slide Show তে ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে, যেখান থেকে ব্যবহারকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী স্লাইডগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে পরপর ডিসপ্লে করতে পারে।

(খ) সেট-আপ (Set-up) কমান্ড গ্রুপ - এই কমান্ড গ্রুপে যে অপশনগুলি থাকে সেগুলি হলো, Set-up Slide Show, Hide slide, Record slide show এবং Rehearse Timing। স্লাইড শো সংক্রান্ত বিভিন্ন অপশনগুলি সেট আপ করার জন্য Set-up slide show তে ক্লিক করতে হবে, তাহলে একটি ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে এবং এই ডায়লগ বক্সের মধ্যে অবস্থিত যেকোন একটি সেট আপ রেডিও বাটনকে চিহ্নিত করে OK বাটন ক্লিক করতে হবে। এই কমান্ড গ্রুপের Hide Slide অপশনটির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট স্লাইডকে প্রয়োজন অনুসারে হাইড করে রাখা যায়। এছাড়া এই কমান্ড গ্রুপের পরের দুটি অপশন record slide show এবং rehearse timing এর সাহায্যে কোনো একটি slide show এর প্রত্যেকটি স্লাইডের প্রেজেন্টশন সময়সীমা সহ রেকর্ডিং করে পরে সমগ্র slide show—টিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) উপস্থাপন করা যায়।

৫.৩ পাওয়ার পয়েন্টের ভিউ সম্পর্কে ধারণা (Concept of Views in Power Point)

পাওয়ার পয়েন্টের বিভিন্ন ভিউ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

নর্মাল ভিউ (Normal View) — সাধারণত Power Point—এ যখন কোনো কাজ করা হয় তখন এই (Normal) নর্মাল ভিউতেই কাজ করা হয়। স্লাইড ডিজাইন এই ভিত্তিতেই করা হয়।

স্লাইড শর্টার ভিউ (Slide Sorter View) — এই ভিউ-এর সাহায্যে কোনো Presentation-এর সব Slideগুলি একসাথে দেখা যায়। এই View-তে সব স্লাইডগুলিতে থাম্ব-নেইল আকারে দেখা যায়। কোনো স্লাইডকে অপ্রয়োজনীয় মনে হলে Delete করে দেওয়া যেতে পারে।

স্লাইড শো ভিউ (Slide Show View) — এই-ভিউ এর সাহায্যে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এই ভিউতে স্লাইডটি কম্পিউটারের মনিটরের পুরো স্ক্রিন জুড়ে অবস্থান করে। পরবর্তী স্লাইডটিকে এই ভিউ-এর সাহায্যে দেখতে হলে কী বোর্ডের Right Arrow (→) প্রেস করতে হবে।

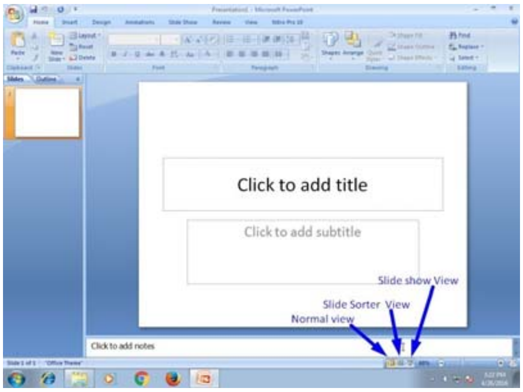

চিত্র ৫.৯ : ভিউস ইন পাওয়ার পয়েন্ট

আউটলাইন ভিউ (Outline View)

এই ভিউ এর সাহায্যে শুধুমাত্র স্লাইডের টেক্সটগুলি দেখা যায়।

৫.৪ স্লাইড ডিজাইন (Slide Design)

MS-Power Point এ স্লাইড ডিজাইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

নতুন স্লাইড যোগ করা (Inserting New Slide)

পাওয়ার পয়েন্টে নতুন স্লাইড যোগ করতে হলে slide tab-এ ক্লিক করতে হবে, তাহলে প্রেজেন্টেশনের সব স্লাইডগুলি পরপর দেখা যাবে। এর পর যে স্লাইডের সঙ্গে নতুন স্লাইড যোগ করতে হবে সেটি সিলেক্ট করতে হবে। এছাড়া slide কমান্ড গ্রুপের New slide option—এর ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করলে স্লাইড লে আউট (slide layout)—এর গ্যালারি খুলে যাবে। সেখান থেকে ব্যবহারকারী তার পছন্দমতো স্লাইড নির্বাচন করলে স্লাইড ইনসার্ট হয়ে যাবে। স্লাইড ইনসার্ট করার আরেকটা পদ্ধতি হল কোনো প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইডের পর New স্লাইডটি দরকার তার উপর Right Click করলে New slide আসবে এবং ক্লিক করতে হবে। স্লাইড তৈরি করার কী-বোর্ড শর্টকার্টটি হল Ctrl + M.

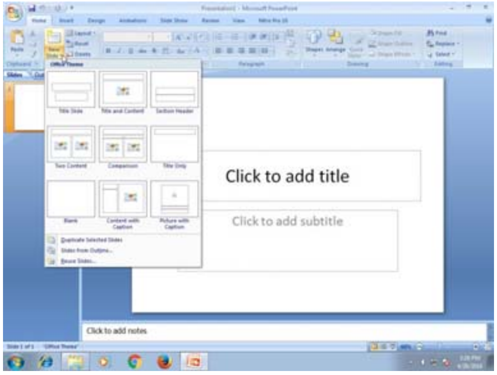

চিত্র ৫.১০ : নতুন স্লাইড যোগ করা

ক্লিপ আর্ট, ছবি, চার্ট যোগ করা (Inserting Clip Art, Picture, Graph)

কোনো স্লাইডে ক্লিপ আর্ট যোগ করার জন্য **insert → clip Art** এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে। তারপর পছন্দমতো ছবি বেছে নিয়ে তার উপর দুবার ক্লিক করতে হবে বা সিলেক্ট করে OK বোতাম প্রেস করতে হবে। তাহলেই পছন্দমতো ছবিটি স্লাইডে যোগ হয়ে যাবে।

কোনো স্লাইডে ছবি ইনসার্ট করতে হলে প্রথমে Insert → Picture এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এরপর পছন্দমতো ছবি বেছে নিয়ে তা সিলেক্ট করে OK ক্লিক করলে পছন্দমতো ছবিটি স্লাইডে যোগ হয়ে যাবে।

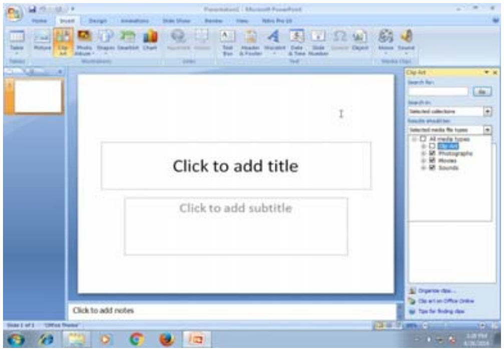

চিত্র ৫.১১ : স্লাইড ডিজাইন

কোনো স্লাইডে গ্রাফ বা চার্ট যোগ করতে চাইলে সেই স্লাইডটিকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে। তারপর ইনসার্ট ট্যাবের Illustrstion কমান্ড গ্রুপের Chart কমান্ড-এ ক্লিক করলে Insert Chart এই ডায়ালগ বক্সটি দেখা যাবে। এরপর প্রয়োজন মতো চার্ট সিলেক্ট করে OK প্রেস করলে একটি ডামি চার্ট দেখা যাবে এবং পাশে একটি MS-Excel ফাইল ওপেন হবে। ডাটা যোগ করা বা ডিলিট করা অর্থাৎ ডাটা এডিটিং অনুযায়ী চার্টটি পরিবর্তিত হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে Excel ফাইলটি ক্লোজ ও সেভ করতে হবে।

পাওয়ার পয়েন্টে টেক্সট আর্ট বা ওয়ার্ড আর্টের ব্যবহার (Use of Text Art or Word Art in Power Point)

পাওয়ার পয়েন্টে Word Art যোগ করার জন্য Insert ট্যাবের Text কমান্ড গ্রুপের Word Art অপশন এ ক্লিক করতে হবে। গ্যালারি থেকে পছন্দের স্টাইল নির্বাচন করলে "Your Text Here" লেখাটি স্লাইডে দেখা যাবে। এবার লেখাটি প্রয়োজনমতো Edit করে নিতে হবে।

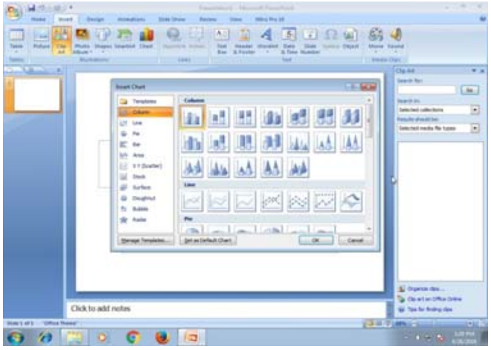

চিত্র ৫.১২ : চার্ট ও ছবি যোগ করা

অ্যানিমেশন, মুভি ক্লিপ ও শব্দের ব্যবহার (Use of Animation Movie Clip and Sound)

স্লাইডের যে object-টিতে অ্যানিমেশন যোগ করতে হবে সেটি প্রথমে সিলেক্ট করে অ্যানিমেশন tab এর অ্যানিমেশন গ্রুপের Custom Animation-এ ক্লিক করলে উক্ত ডায়লগ বক্সটি খুলে যাবে। তারপর Add Effect Button-এ ক্লিক করলে চারটি অপশন (Entrance, Emphasis, Exit, Motion Path) দেখা যাবে। প্রয়োজন অনুসারে effect সিলেক্ট করতে হবে এবং play বা slide show বাটনে ক্লিক করলে অ্যানিমেশনটি দেখা যাবে। কোনো স্লাইডে মুভি যোগ করতে হলে Insert ট্যাবে এর Media Clips গ্রুপের Movie-এর ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি অপশন বর্তমান যেমন– Movie from file ও Movie from Clip organizer। Movie from file-এ ক্লিক করলে কম্পিউটার থেকে Movie ফাইল সিলেক্ট করতে হবে। অন্যদিকে Movie from organizer-এ ক্লিক করলে Clip Art ডায়লগ বক্স কিছু Movie ক্লিপ নিয়ে ওপেন হবে। এরপর পছন্দমতো মুভি সিলেক্ট করতে হবে।

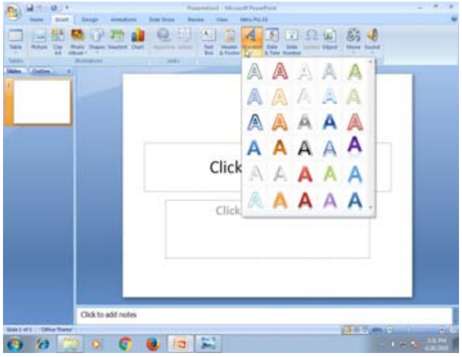

চিত্র ৫.১৩ : ওয়ার্ড আর্ট যোগ করা

Movie ক্লিপের মতো সাউন্ড যোগ করার পদ্ধতি ও একই রকম। এখানে Insert ট্যাব-এর Media Clips-এর সাউন্ডের ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করলে sound from file এবং sound from clip organizer এই দুটি অপশন আসবে। Sound from file-এ ক্লিক করলে কম্পিউচার থেকে সাউন্ড সিলেক্ট করতে হবে। অন্যদিকে sound from clip organizer -এ ক্লিক করলে clip Art sound সহ অনেক সাউন্ডের অপশন আসবে এবং পছন্দমতো sound সিলেক্ট করতে হবে। এর পর একটি মেসেজ আসবে যেখানে দুটি অপশন থাকবে, একটি Automatically এবং অন্যটি when clicked। এক্ষেত্রে Autometically সিলেক্ট করলে সাউন্ডটি স্ক্রিনে এলেই সাউন্ড বাজবে। অন্যদিকে when clicked সিলেক্ট করা হলে sound Icon-এ যতক্ষণ না ক্লিক করা হচ্ছে ততক্ষন সাউন্ড হবে না।

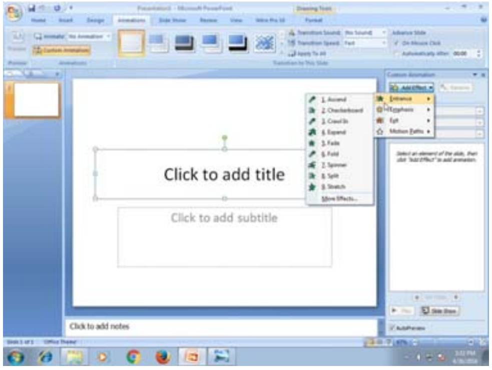

চিত্র ৫.১৪ : অ্যানিমেশনের ব্যবহার

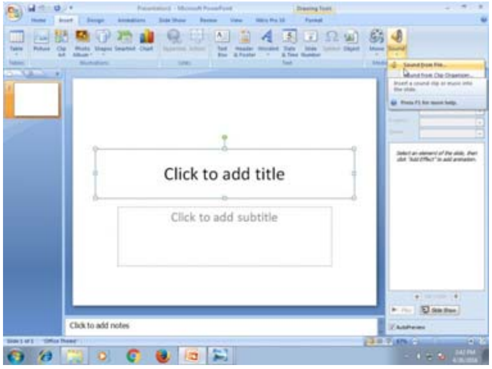

চিত্র ৫.১৫ : মুভি ক্লিপের ব্যবহার

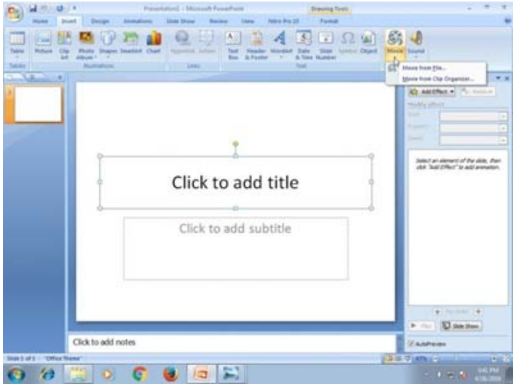

চিত্র ৫.১৬ : সাউন্ডের ব্যবহার

৫.৫ স্লাইড প্রেজেন্টশন ও প্রিন্টিং (Slide Show and Slide Printing)

প্রথমে যে প্রেজেন্টেশনটি প্রদর্শন করতে হবে তাকে ওপেন করতে হবে। তারপর View → Slide show এই ক্রমানুসারে ক্লিক করতে হবে। একই কাজ সরাসরি F5 বাটনের সাহায্যেও করা যায়। তারপর পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য কী বোর্ডের Page Down Key প্রেস করে করে যেতে হবে। Slide show চলাকালীন মাঝপথ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কী বোর্ডের Esc বাটন প্রেস করতে হবে।

Power Point-এ স্লাইড প্রিন্ট করতে হলে Office Button থেকে Print অপশন সিলেক্ট করতে হবে অথবা Ctrl + P প্রেস করলেও Print ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখানে প্রিন্ট করার অপশনগুলি সিলেক্ট করে OK করলে প্রিন্ট শুরু হবে। প্রিন্ট করার আগে প্রিন্ট Preview দেখতে চাইলে Office বাটন থেকে Print → Print preview এই অনুসারে ক্লিক করতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, যে Current slide নির্বাচন করে প্রিন্ট নির্দেশ দিলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্লাইডটি প্রিন্ট হবে। আবার Slide অপশনটি নির্বাচন করে টেক্সট বক্সে যত যত সংখ্যা লেখা হবে প্রেজেন্টশনের তত তত নম্বর স্লাইড প্রিন্ট হবে।

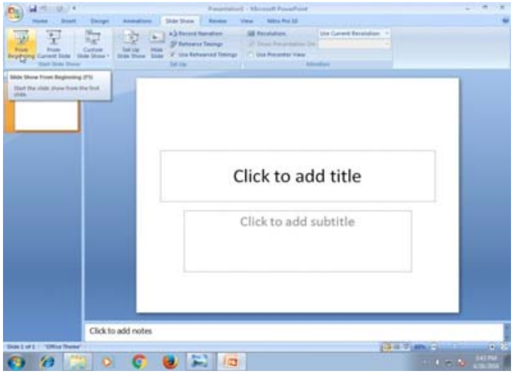

চিত্র ৫.১৭ : স্লাইড উপস্থাপনা

৫.৬ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা (Planning Lessons using Power Point)

পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে স্লাইড তৈরির আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

- স্লাইড তৈরির আগে স্লাইডে যে বিষয়বস্তু লেখা হবে তা এক জায়গায় সংগ্রহ করে খাতায় লিখে নেওয়া ভালো।
- কোন্ কোন্ ছবি, ডায়াগ্রাম, বা ক্লিপ আর্ট রাখা হবে তা আগে থেকেই নির্বাচন করে রাখতে হবে।
- স্লাইডের টাইটেল বোল্ড করে বড়ো করে লেখা যেতে পারে এবং ফন্টের আকার 20-র বেশি না-হওয়াই ভালো।
- একটি স্লাইডের বেশি লাইন না থাকাই ভালো।
- টেবিল বসাতে চাইলে তা যেন বেশি বড়ো না হয়।

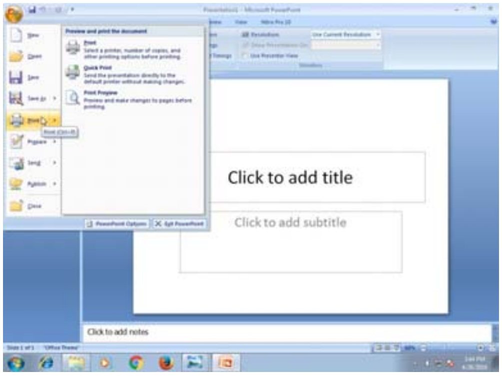

চিত্র ৫.১৮ : স্লাইড প্রিন্টিং

নীচে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার (Lesson Plan) উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা

কলানবগ্রাম, বর্ধমান

শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ঃ সৌরভ মন্ডল

ক্রমিক সংখ্যা ঃ ১৭

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৩-১৫

শ্রেণি ঃ চতুর্থ

একক ঃ বনভোজন

উপএকক ঃ বনভোজন

আজকের পাঠ ঃ বনভোজন

সময় ঃ ৪০ মিনিট

বনভোজন

গোলাম মোস্তাফা

নূরু, পুষি, আয়েষা, শফি—সবাই এসেছে,
আম-বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে!
রাঁধুনিদের শখের রাঁধার পড়ে গেছে ধুম,
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
বাপ-মা তাদের ঘুমিয়ে আছে, এই সুবিধা পেয়ে
বনভোজনে মিলেছে আজ দুষ্টু ক'টি মেয়ে!

প্রঃ বনভোজন খেলতে কারা এসেছে?

উঃ নূর, পুষি, আয়েষা, শফি।

প্রঃ সবাই কোথায় খেলতে এসেছিল?

উঃ আম বাগিচার তলায়।

শব্দার্থ লেখ ঃ

বাগিচা

উঃ- বাগান

মিঠে

উঃ - মিষ্টি

মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম

বসে গেছে সবাই আজি — আয়োজনে।

বাক্য রচনা করো ঃ

বনভোজন -

আয়োজন -

জেলা শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংস্থা

বর্ধমান

শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ঃ সৌরভ মন্ডল

ক্রমিক সংখ্যা ঃ ১৭

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৩-১৫

বিষয় ঃ কম্পিউটারের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা

শ্রেণি ঃ অষ্টম

একক ঃ রঙিন কার্ড দিয়ে সমকোণী চৌপল তৈরি করা

উপএকক ঃ ঐ

আজকের পাঠ ঃ ঐ

সময় ঃ ৪০ মিনিট

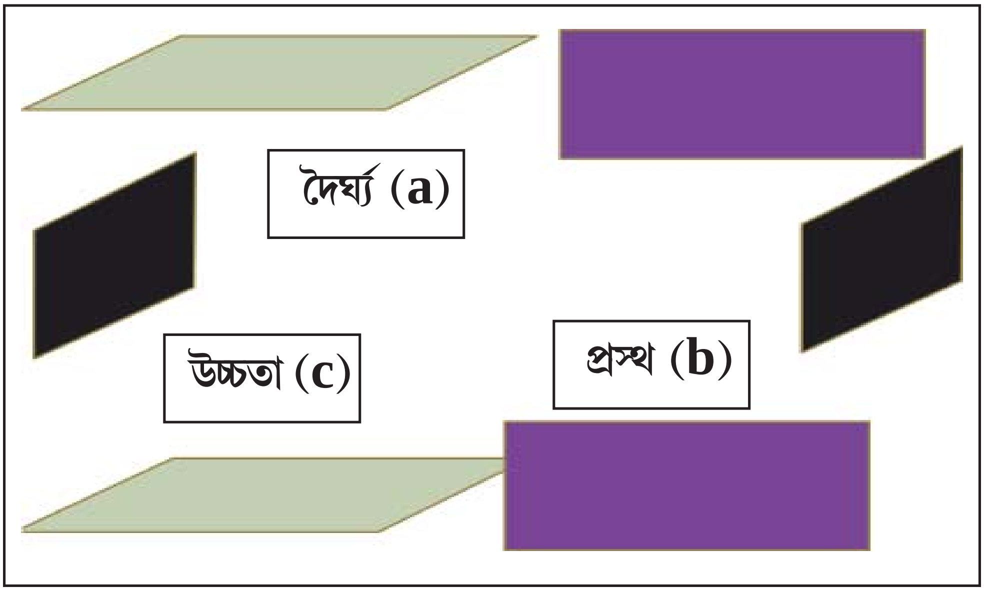

সমকোণী চৌপলের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল =

2 (দৈর্ঘ্য × উচ্চতা + দৈর্ঘ্য × প্রস্থ + উচ্চতা × প্রস্থ)

= 2 (a*c + a*b + b*c)

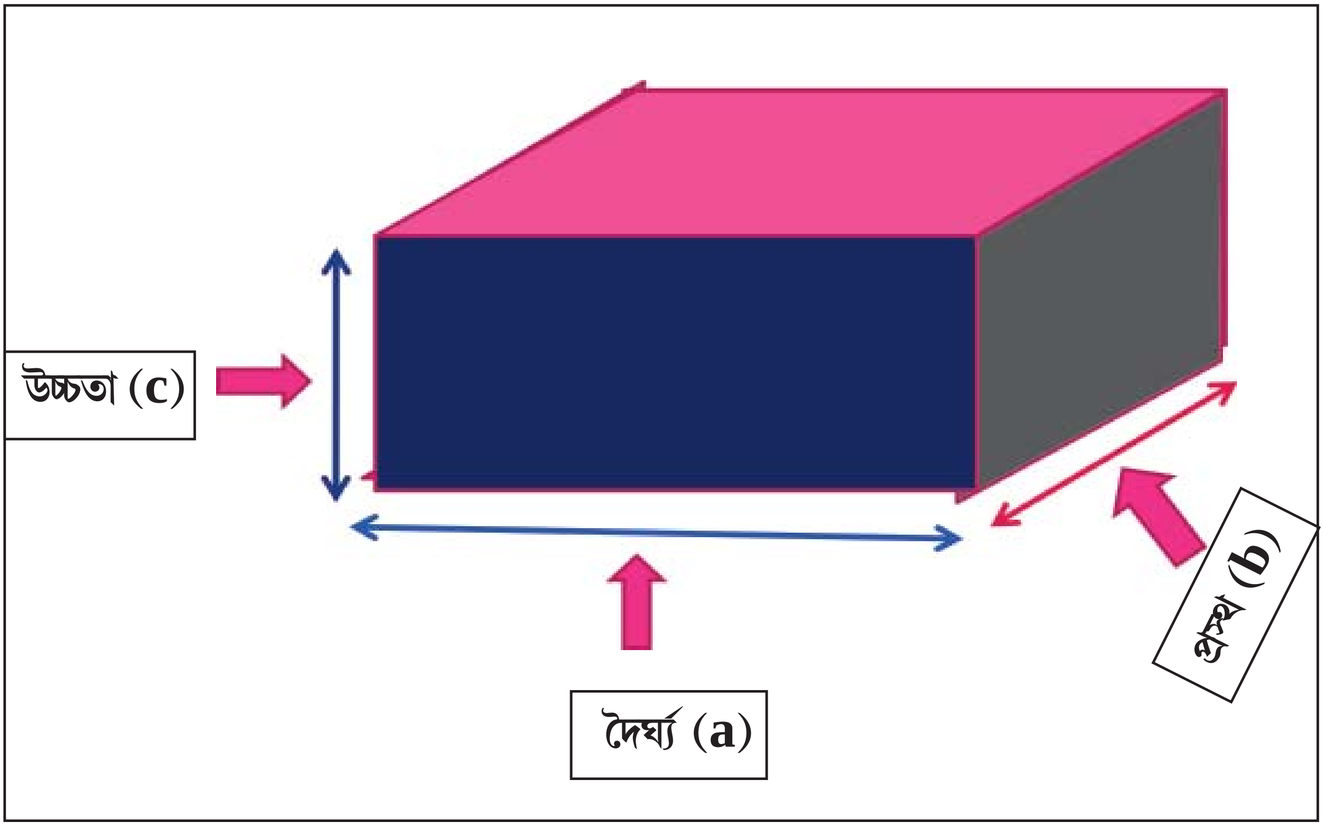

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর ঃ

১। একটি সমকোণী চৌপলের তলসংখ্যা হল ঃ

(ক) ৪ টি (খ) ৩ টি (গ) ৬ টি

২। একটি সমকোণী চৌপলের শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হল ঃ

(ক) ৬ টি (খ) ৮ টি (গ) ৪ টি

৩। সমকোণী চৌপলের দৈর্ঘ্য ৬ সেমি, প্রস্থ ৩ সেমি, উচ্চতা ২ সেমি হলে চৌপলের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হবে ঃ

(ক) ৩৬ ব: সেমি (খ) ৭২ ব:সেমি (গ) ৫৪ ব: সেমি

১। ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হবে

(ক) ১২৫ ব: সেমি (খ) ১৫০ ব: সেমি (গ) ২৫ ব: সেমি

২। ৫ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকের আয়তন

(ক) ১২৫ ঘ: সেমি (খ) ১৫০ ঘ: সেমি (গ) ৬২৫ ঘ: সেমি

সারসংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ে মাইক্রোসফট অফিসের পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপলিকেশনের মধ্যে পাওয়ার পয়েন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল। একে একটি প্রেজেন্টেশন সফটওয়ার ও বলা হয়।
- পাওয়ার পয়েন্টে চারটি ভিউ আছে– নর্মাল ভিউ, আউট লাইন ভিউ, স্লাইড ভিউ ও স্লাইট শর্টার ভিউ।
- স্লাইডের মধ্যে টেক্সট, ছবি, ক্লিপ আর্ট, চার্ট, গ্রাফ, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে যোগ করা যায়। স্লাইড আকর্ষণীয় করার জন্য অ্যানিমেশন টেমপ্লেট, শব্দ ইত্যাদি যোগ করা যায়।
- স্লাইড প্রেজেন্টেশনের বিষয়গুলো আগে থেকে ঠিক করে রাখলে প্রেজেন্টেশন করতে সুবিধা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড (Key Words)

Animation, Design Template, Chart, Movie, Sound, Power Point, Slide, Slide Show, Timing, Out lime, View.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) পাওয়ার পয়েন্ট কী?

(২) পাওয়ার পয়েন্টে কোনো প্রেজেন্টেশন করতে গেলে কী কী বিষয়গুলি জানা দরকার?

(৩) স্লাইডে কী ভাবে ছবি যোগ করা যায়? বিশদে আলোচনা কর।

(৪) স্লাইডে এক্সেল থেকে নিয়ে কীভাবে চার্ট যুক্ত করা যায়? বিশদে আলোচনা করো।

(৫) পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহারের সুবিধাগুলি কী কী?

(৬) একটি স্লাইডে কোনো সাউন্ড বা ভিডিও ক্লিপ কীভাবে সংযোজন করা যায়?

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করে পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে নিজের পছন্দমতো একটি পাঠ টীকা (Lesson Plan) তৈরি করো।

(ক) কমপক্ষে ১০ টি স্লাইড হবে।

(খ) স্লাইড ট্রানজিশনের জন্য অ্যানিমেশন ব্যবহার করতে হবে।

(গ) কাস্টম অ্যানিমেশন যোগ করতে হবে, যেমন – Entrance, Emphasis, Exit, Motion Path ইত্যাদি।

(ঘ) উপযুক্ত ভিডিও ক্লিপ এবং অডিও যোগ করতে হবে।

(ঙ) অটোমেটিক স্লাইড প্রেজেন্টশেনের অপশন ব্যবহার করতে হবে।

অধ্যায়
৬

কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন

৬.১ সূচনা (Introduction)

বর্তমান যুগে "Chalk এবং talk"পদ্ধতিতে শিখন অচল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কারণ এই পদ্ধতিতে শিখনের মাধ্যম হল Chalk এবং কথাবার্তা যা ক্লাসরুমে একঘেয়েমির পরিবেশ গড়ে তোলে এবং ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারায়। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিখনের 3R এখন বিস্তৃত অর্থে 4R হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সেখানে রিডিং, রাইটিং এবং অ্যারেথমেটিক এর-সঙ্গে ROBOT বা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কম্পিউটারকে ধরে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আমরা তিনটি 'A'-র কথা শিখনে ব্যবহার করি। এই তিনটি 'A' হল এজ, এবিলিটি এবং অ্যাপটিটিউড (aptitude)। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে। যার ফলে শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহ, বিষয়বস্তুর প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সুস্পষ্ট ধারণা গঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিত্তিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার নানা নামকরণ হয়েছে। যেমন–

- Computer Aided Learning (CAL)
- Computer Aided Instruction (CAI)
- Computer Based Training (CBT)
- Computer Managed Instruction (CMI)
- Computer Mediated Education (CME) এবং
- Computer Assisted Instruction (CAI)

এই অধ্যায়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা বা CAL (Computer Aided Learning) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি থেকে শিক্ষার্থীরা যেসকল বিষয়ে অবগত হবে সেগুলি হল ঃ

- কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখনের প্রাথমিক ধারণা এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখনের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানা যাবে।
- শিখনের জন্য শিখন সহায়ক বিষয়বস্তুর নির্দেশনায় প্রয়োগ সম্পর্কে জানা যাবে।

৬.২ কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের ধারণা ও পদ্ধতি (Concepts and Methods of Computer Aided Learning)

মূলত কম্পিউটারে প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে CAL এর ধারণা জন্মায়। কম্পিউটারের প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশনের সাহায্যে শিক্ষাদানের জন্য প্রচুর পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই তথ্যগুলিকে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক কথায় আমরা বলতে পারি CAL হল একটি শিক্ষা নির্দেশনার টুল এবং এর দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিসরের শিক্ষা নির্দেশনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয় শিখনে ব্যবহার করতে পারে।

মানুষের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করে তা দেখার মাধ্যমে CAL-এর উৎপত্তি হয়। প্রথম দিকে প্রোগ্রাম নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু হয়। এই প্রোগ্রামগুলি হল কম্পিউচটারের সঞ্চিত তথ্য ছাপনো, মাল্টিপাল চয়েস প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

১৯৬০ সালে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে PLATO (Programme Logic for Automatic Teaching Operation)-এর প্রচলন হয়। পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে স্ট্রান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যাট্রিক সাপস্ প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটারের মাধ্যমে গণিত এবং 'পাঠ' এর টিউটোরিয়াল প্রচলন করেন। এরপর আরও অনেক CAL প্রোগ্রাম প্রস্তুত এবং প্রয়োগ হবার ফলে শিক্ষায় কম্পিউটারের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়।

কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের তিনটি পদ্ধতি আছে; যেমন—লোগো (Logo), সিমুলেশন (Simulation) এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

লোগো (Logo)

CAL -এর মাধ্যমে শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির নাম হল লোগো (Logo)। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন MIT বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্জিং (Feurzeing) এবং পাপর্ট (Papart) নামক দুই অধ্যাপক। লোগো প্রোগ্রামের ভাষা খুবই সহজ সরল। এর জন্যই এটি শিশুশিক্ষার জন্য উপযোগী। এই পদ্ধতির প্রোগ্রামের নির্দেশ অনুসারে শিশুরা ছবি আঁকতে পারে। কখনও শিশুরা নিজেরাই প্রোগ্রাম তৈরি করে নিজেদের খুশি মতো তাদের উপযোগী কাজ করতে পারে।

সিমুলেশন (Simulation)

লোগো (Logo) -এর তুলনায় উচ্চস্তরের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে CAL -এর সিমুলেশন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির দুটি বিভাগ হল সিমুলেশন এবং গেমিং। এখানে PLATO এবং PLATO IV ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফলের পোকার কীভাবে প্রজনন বা বৃদ্ধি ঘটে তা শিমুলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে দেখানো যায়। সাধারণত গবেষণাগারে মাছির প্রজনন ঘটাতে তিন সপ্তাহ সময় লাগে, আর মাছি মরে গেলে আরও বেশি সময় লাগে। এক্ষেত্রে সিমুলেশন পদ্ধতিতে PLATO প্রোগ্রামে এই প্রক্রিয়াটি অনেক তাড়াতাড়ি প্রদর্শন করানো যায়।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)

CAL -এর তৃতীয় ধরন হল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Controlled Learning)। এখানে ঠিক শ্রেণিকক্ষের মতোই শিক্ষার্থী বারবার অভ্যাস করতে পারে। শিক্ষক কেবলমাত্র একবার ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। তারপর শিক্ষার্থীরা নিজেই কম্পিউটারে নিজের মতো বারবার অভ্যাস করতে পারে এবং নিজেদের কোথায় ভুল হচ্ছে তা বুঝতে পারে। প্রসঙ্গত CAL সিস্টেম পরীক্ষিত ধারণার উপর তৈরি। ফলে শিক্ষণ এবং শিক্ষা পদ্ধতিতে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। যেসমস্ত ধারণার উপরে ভিত্তি করে CAL প্রস্তুত করা হয় তার কয়েকটি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

- CAL সিস্টেমে যুক্ত বিভিন্ন টারমিনাল থেকে এক সঙ্গে ৪০০০ বা তার বেশি সংখ্যক শিক্ষক একই সময়ে এই সিস্টেম ব্যবহার করতে পারে এবং তাতে গুণগত মানের কোনোরকম অবনমন হয় না।
- CAL -এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শেখার সঙ্গে সঙ্গে তা কম্পিউটারের মধ্যে রেকর্ড হয়ে যায়। তার ফলে শিক্ষক ঐ রেকর্ড করা অংশ থেকে দেখে শিক্ষার্থী সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারে।
- CAL -এর মাধ্যমে নানা ধরনের বিষয়বস্তু নানভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষক কী কৌশল অবলম্বন করবেন, কী কী লেখা থাকবে, কী কী ছবি থাকবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

৬.৩ শিখন শিক্ষণ সহায়ক বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা (Preperation of Learning Teaching Materials)

কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষণের জন্য শিখন সহায়ক বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে যেসব মোড বা প্রসেস ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল—টিউটোরিয়াল মোড, ড্রিল এবং প্র্যাকটিস মোড, সিমুলেশন মোড, ডিসকভারি মোড এবং গেমিং মোড। নীচে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

টিউটোরিয়াল মোড

এই মোডে ছোটো ছোটো ধাপে ধাপে তথ্য দেবার পরে একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর উত্তর কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রয়োজনমতো ফিডব্যাক (feedback) দেওয়া হয়। এই মোড রৈখিক প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনের সমতুল্য, তবে এক্ষেত্রে রৈখিক এবং শাখা পদ্ধতি (Linear এবং Branch) উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। নীচে এই পদ্ধতিতে কীভাবে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যায় তা দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন-১	→	প্রশ্ন-২	→	প্রশ্ন-৩	→	প্রশ্ন-৪	→	প্রশ্ন-৫
ফ্রেম-১		ফ্রেম-২		ফ্রেম-৩		ফ্রেম-৪		ফ্রেম-৫

চিত্র ৬.১ : রৈখিক (Linear) পদ্ধতিতে শিখন সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত পদ্ধতি

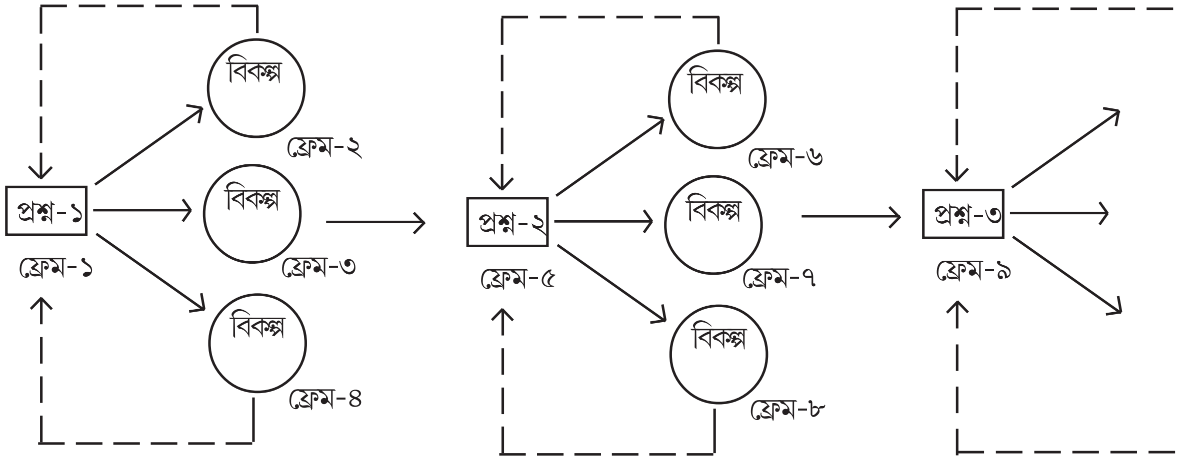

চিত্র ৬.২ : শাখা পদ্ধতিতে (Branch) শিখন সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত পদ্ধতি

ড্রিল এবং প্র্যাকটিস মোড

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক ভাবে সহজ থেকে জটিল ধারণা বা নীতির উদাহরণ দেওয়া হয়। মূলত শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সাহায্যে পারদর্শী করে তোলার জন্যই সহজ থেকে কঠিন ধারণার উদাহরণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমস্ত সঠিক উত্তরগুলো রিইনফোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয় এবং ভুল উত্তরগুলোর কারণ খুঁজে বার করে সঠিক করার চেষ্টা করা হয়।

সিমুলেশন মোড

এই মোডে শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিকভাবে বাস্তব অবস্থার সাথে মিল আছে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়। সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হবে এমন বিষয়বস্তু কম্পিউটারে বাছা হয়। উদাহরণ স্বরূপ– এরোপ্লেন চড়া, দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া ইত্যাদি।

ডিসকভারি মোড

এই মোডে অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত এই মোডে শিক্ষার্থীকে ভুল এবং প্রচেষ্টা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে শেখানো হয়।

গেমিং মোড

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়ে খেলার মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয়। শিখনের মান খেলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ– বানান শেখার খেলা, সাধারণ জ্ঞানের খেলা ইত্যাদি।

৬.৪ শিখন সহায়ক উপকরণের প্রয়োগ (Application of the Learning Teaching Materials)

একবিংশ শতাব্দীতে CAL মেটিরিয়ালসের প্রয়োগ আধুনিক শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। শিখনের ক্ষেত্রে শিখন সহায়ক বিষয় বস্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুতি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার্থী বা শিক্ষকগণ এই CAL মেটিরিয়াল প্রস্তুত করতে যেসব কাজ করেন তা পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—
পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning), তথ্য সংগ্রহ (Information Collection), অভীক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগ (Testing & Test Construction), নির্দেশ দান ও শিক্ষণ (Instruction & Teaching) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

CAL মেটিরিয়াল তৈরি করতে Powerpoint নামক একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের ব্যবহার প্রয়োজন হয় এবং এই মেটেরিয়াল ব্যবহারের জন্য CAL Oriented শ্রেণিকক্ষের দরকার। নীচে CAL মেটিরিয়াল প্রস্তুত করার ধাপগুলি (স্তরগুলি) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning)

এই স্তরে বিষয় নির্বাচন, বিষয়ের কোন্ অংশ নেওয়া হবে এবং কীভাবে শিখন করানো হবে তার পরিকল্পনা করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ (Information Collection)

এই স্তরে পরিকল্পনা করে CAL এর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে text এবং ছবি সংগ্রহ করা হয়।

অভীক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগ (Testing & Test Construction)

এই স্তরে সংগৃহীত তথ্য বাছাই করা হয় এবং বাছাই তথ্য বা text এক জায়গায় লিখে রেখে উপযুক্ত জায়গায় তা ব্যবহার করা হয়।

নির্দেশদান ও শিক্ষণ (Instruction & Teaching)

এই স্তরে text বা ছবি কোন স্থানে পর্যায়ক্রমে শিখনে ব্যবহার করা হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে CAL-এর মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর শিক্ষাদান সম্পন্ন করা যায়।

মূল্যায়ন (Evaluation)

এই স্তরে শিখনের বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করতে কতগুলি প্রশ্ন করা হয়।

নীচে উদাহরণ সহযোগে একটি পাঠটীকা (Lesson Plan) দেখানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা

কলানবগ্রাম বর্ধমান

শিক্ষকের নাম : কমল রায়

ক্রমিক সংখ্যা : ৩৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-১৫

বিষয় : কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা

শ্রেণি : চতুর্থ

একক : পরিবেশের উপাদান জীবজগৎ

উপএকক : নানা ধরনের প্রাণী

আজকের পাঠ : ঐ

সময় : ৪০ মিনিট

আমাদের চারপাশে কতরকম প্রাণী রয়েছে বলো তো ! কেউ উড়ে বেড়ায়। কেউ সাঁতার কাটে। কেউ চার পায়ে হাঁটে। কেউ দুপায়ে। কারোর আবার অনেক পা। কেউ আবার বক্ষে হেঁটে চলে। কেউ থাকে জলে। কেউ আবার মাটির তলায় বেশ আনন্দে থাকে। সব প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এদের নানারকম রং। এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় সুন্দর। এরা নিজেদের মতো জায়গা খুঁজে নেয়। খাবার জোগাড় করে। নতুন নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়। আবার বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এইভাবেই একই পরিবেশে আমরা সবাই মিলে বেঁচে থাকি।

জলে থাকে এমন দুটি প্রাণীর নাম বলো

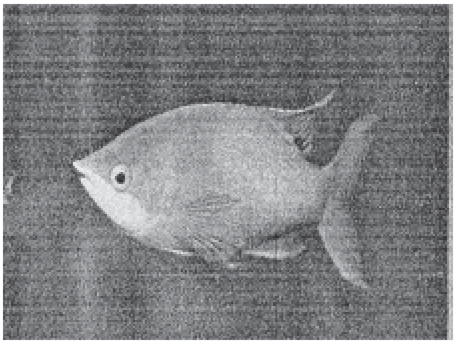

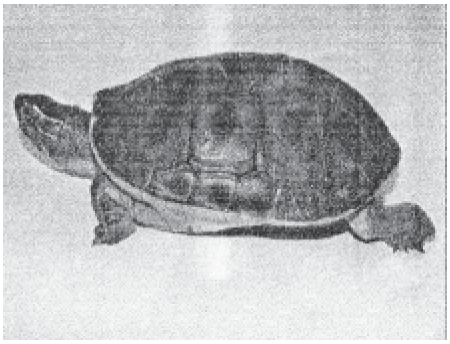

মাছ ও কচ্ছপ

চার পায়ে হাঁটে এমন দুটি প্রাণীর নাম করো।

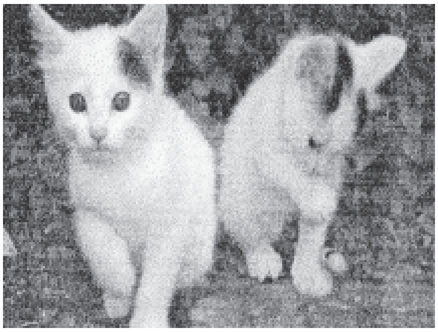

কুকুর ও বিড়াল

অনেকগুলি পা আছে এমন তিনটি প্রাণীর নাম বলো।

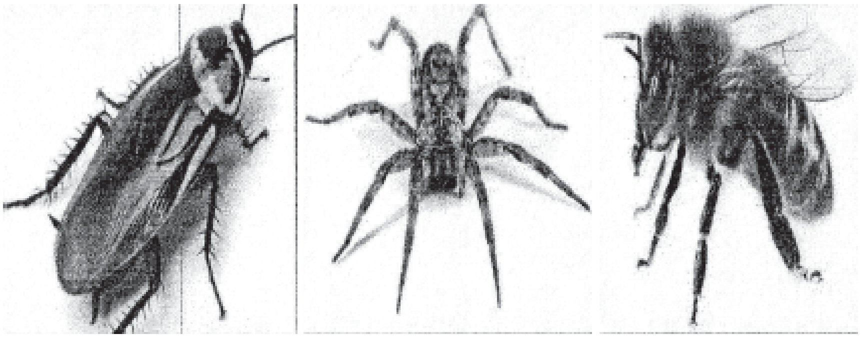

আরশোলা, মাকড়সা ও মৌমাছি

বুকে হেঁটে চলে এমন তিনটি প্রাণীর নাম বলো।

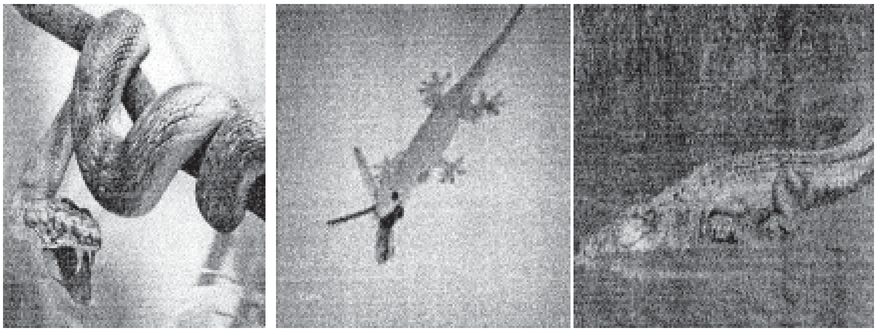

সাপ, টিকটিকি ও কুমির

পাশাপাশি দুটি প্রাণীর ছবি দেওয়া আছে।
এদের একটা মিল ও একটা অমিল লেখো।

প্রাণী | প্রাণী

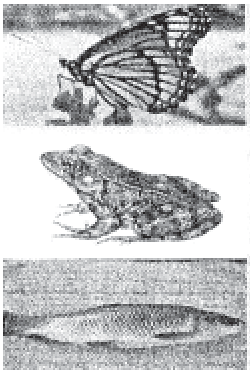

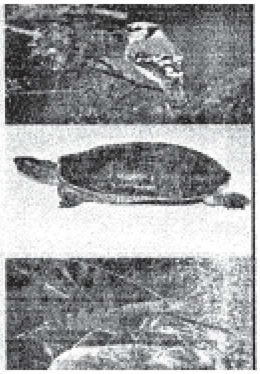

মাছ ও কচ্ছপ

৬.৫ নির্দেশনাদান পদ্ধতিতে 'ক্যাল' বিষয়বস্তুর প্রয়োগ (Application of CAL Materials in the Instructional Method)

প্রকৃতপক্ষে CAL বা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখন কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফ্‌টওয়্যার এবং পাঠক্রমের সমন্বয় সাধনের একটি ব্যবস্থা যা সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত স্তরেই ব্যবহার করা যায়। এখানে প্রাথমিক স্তরে কীভাবে পড়তে শেখানো হয় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসবে এবং প্রয়োজনে কী-বোর্ড বা মাউস ব্যবহার করবে। এই পদ্ধতিটিতে মূলত তিনটি স্তর আছে — প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর এবং তৃতীয় স্তর।

প্রথম স্তর

এই স্তরে প্রথমে কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্দায় একটি অক্ষর দেখানো হয়। এবার শিক্ষার্থীকে রেকর্ড করা স্বরের সাহায্যে অক্ষরটি চেনানো হয় এবং মনিটরে সঠিক অক্ষরটি লাইট-পেন দিয়ে দেখাতে বলা হয়। এভাবে একের পর এক অক্ষর দেখিয়ে বলে দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীকে সঠিক অক্ষর চিহ্নিত করতে বলা হয়। নীচে চিত্রের সাহায্যে এই পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে।

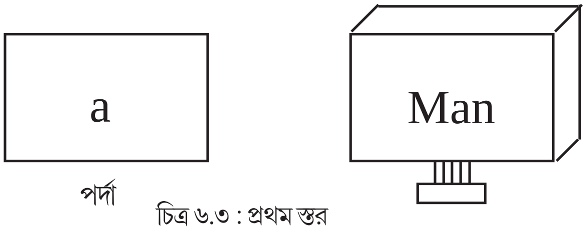

চিত্র ৬.৩ : প্রথম স্তর

দ্বিতীয় স্তর

প্রথম স্তরে অক্ষর পরিচিতি হয়ে গেলে দ্বিতীয় স্তরের শুরু হয়। এখানে পর্দায় কিছু যুগ্ম শব্দ দেওয়া হয় এবং মনিটরে কয়েকটি যুক্ত অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করতে বলা হয়। নীচে চিত্রের সাহায্যে এই পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে।

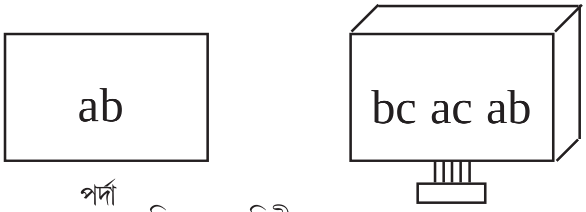

চিত্র ৬.৪ : দ্বিতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর

এই স্তরে মনিটরের একদিকে একাধিক যুক্ত অক্ষর ও সংখ্যা থাকে এবং অন্যদিকে একাধিক যুক্ত অক্ষর থাকে। দুদিকের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলোতে সম্পূর্ণ মিল আছে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়।

Man	Can
Cam	Cat
Can	man
00	0

চিত্র ৬.৫ : তৃতীয় স্তর

উপরের মনিটরে একদিকে Man, Cam, Can, 00 এবং অন্যদিকে Can, Cat, man, 0 শব্দ আছে। যে শব্দগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে সেই শব্দগুলি শিক্ষার্থী চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল আছে Can শব্দটির।

এরপর শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে। কম্পিউটারে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর ভুল হলে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক সাহায্য করবে এবং ঠিক হলে প্রশংসা করবে।

৬.৫.১ ক্যাল পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in CAL Process)

CAL পদ্ধতির মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থী যদি কোনো ভুল করে থাকে, তবে কম্পিউটার শিক্ষককে নির্দেশ দেয় এবং শিক্ষক ব্যক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থীর একই সমস্যা হলে শিক্ষক প্রোগ্রামটিকে পুনরায় পরিবর্তনের চেষ্টা করে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, CAL পদ্ধতি শিক্ষকের ভূমিকা মোটেই ছোটো করে না, বরঞ্চ তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের শিক্ষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। বর্তমানে শিক্ষায় ‘‘ইন্টেলিজেন্ট টিউটবিং’’ পদ্ধতি ব্যবহার করে CAL কে অনেক উন্নত মানের করা হয়েছে। একটি সম্পূর্ণ CAL সিস্টেম প্রস্তুত করতে গেলে কিছু দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয়। এনাদের সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

- কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার— CAL সিস্টেম প্রস্তুতির জন্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্ত রকম সাপোর্ট দেবার জন্য ইনি দায়বন্ধ।
- অনুপাঠের লেখক — সাধারণত একজন শিক্ষক এই কাজটি করে থাকেন।
- সিস্টেম অপারেটর — ইনি সমস্ত CAL ব্যবস্থায় সিস্টেম ও শিক্ষার্থীর মাঝে মিডিয়েটর হিসাবে কাজ করেন।

৬.৬ কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখনের বিষয়বস্তু তৈরি করার প্রকল্পভিত্তিক কাজ (Project Activities on Preparation of CAL Materials)

১৯০০ সালে পি আর রিচার্ডসন প্রকল্প বা প্রোজেক্ট শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯০৮ সালে প্রোজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডা: স্টিভেনসন বলেন প্রোজেক্ট হল একটি সমস্যামূলক কাজ যা স্বাভাবিক পরিবেশে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এককথায় বলা যায় প্রকল্প হল একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সমস্যামূলক কাজ যা স্বাভাবিক জীবনভিত্তিক সামাজিক পরিবেশে সক্রিয়তা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। CAL এর মাধ্যমে শিক্ষাদান হল একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজ যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা শিখনের প্রতি সক্রিয় হয়, আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বিষয়বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পভিত্তিক কাজে শিক্ষার্থীরা চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে প্রকল্পটির বাস্তব রূপদান করতে সক্ষম হয়। এই স্তরগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

(ক) উদ্দেশ্য নির্ণয় স্তর

এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি বা উদ্দেশ্যগুলি নির্ণয় করে কী কাজে ব্যবহার করবে তা শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যক্ত করে। এই প্রকল্পটি তৈরি করলে শিক্ষার্থীরা কী বিশেষ জ্ঞান অর্জন করবে সেই সম্পর্কে শিক্ষর্থীরা জানতে পারে।

(খ) পরিকল্পনা স্তর

প্রথম স্তরে কোনো বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য নির্ণয় হয়ে যাওয়ার পর এই স্তরে সমস্যাটিকে কীভাবে সমাধান করা যাবে তা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়। বিষয়বস্তুর কতটা অংশ নেওয়া হবে, কাজটি ক-টি অংশে ভাগ হবে, কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ হবে, তার পরিকল্পনা এই স্তরে করা হয়।

(গ) কর্ম সম্পাদন স্তর

দ্বিতীয় স্তরে যে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা হয়েছে সেই কাজটি এই স্তরে রূপদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজেদের বিচারবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিখনের বিষয়বস্তু তৈরির কাজগুলি সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার, ওয়েব টুল, সাউন্ড রেকর্ডিং ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করে।

(ঘ) মূল্যায়ন স্তর

কাজটি সম্পাদনের পর এর ফলাফল নিয়ে এই স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়ন করে।

উদাহরণ সহযোগে শিখনের বিষয়বস্তু কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তা দেখানো হয়েছে।

বিষয় : কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা
শ্রেণী : চতুর্থ
একক : পোশাক
উপএকক : ঋতুবদলে পোশাক বদল

উদ্দেশ্য নির্ণয় :

১. ঋতু বদলে আমরা কী কী পোশাক পরি সে সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. বর্ষাকালে কোন পোশাক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় সে সম্পর্কে জানা।

৩. বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পোশাক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

পরিকল্পনা :

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে দলে ভাগ হয়ে কাজটি সম্পন্ন করবে।

প্রথম দল : ঋতু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে।

দ্বিতীয় দল : ঋতু সম্পর্কিত ছবি সংগ্রহ করবে।

তৃতীয় দল : এই তথ্য এবং ছবির সমন্বয় সাধন করবে।

কর্ম সম্পাদন :

পরিকল্পনা স্তরে সংগৃহীত তথ্য বা লেখা এবং ছবি নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি (MS-Office এর Power Point, Multimedia Web ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা CAL মেটিরিয়াল তৈরি করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নির্দেশ দেবে।

মূল্যায়ন :

এই স্তরে CAL বিষয়বস্তুটি আরও আকর্ষণীয় এবং শিখনের উপযোগী করার জন্য কিছু শূন্যস্থান পূরণ প্রশ্ন, মাল্টিপেল চয়েস প্রশ্ন, ইত্যাদি প্রস্তুত করে সেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। নীচে উদাহরণ সহযোগে সমস্ত বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা

কলানবগ্রাম, বর্ধমান

শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ঃ শম্ভুনাথ গাঙ্গুলী

ক্রমিক সংখ্যা ঃ ৪২

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৩-১৫

বিষয় – কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ শিক্ষা

শ্রেণি : চতুর্থ

একক : পোশাক

উপএকক : ঋতুবদল ও পোশাক বদল

আজকের পাঠ : ঐ

সময় : ৪০ মিনিট

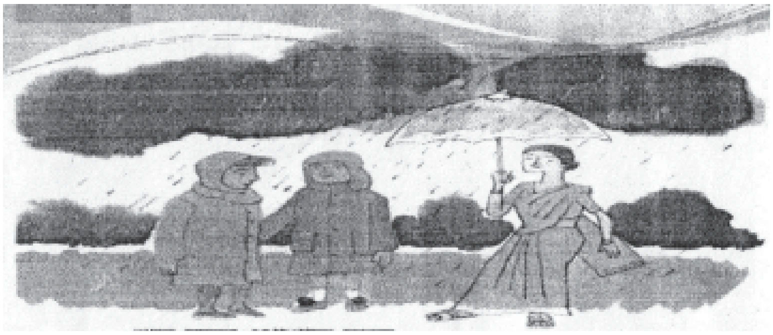

ঋতু-বদল পোশাক-বদল

কাজের সময় মানুষ যে পোশাক পরে, অন্যসময় তা পরে না। বাড়িতে কেউ স্কুলের ইউনিফর্ম পরে থাকে না। বাইরে গেলেই অন্য পোশাক পরে।

শীতের সময় অবশ্য স্কুলেও নানা রঙের সোয়েটার পরা যায়, যার যা আছে। মুন্নি ফুল আঁকা একটা সোয়েটার পরে। বাবাইদা একটা বুক খোলা মোটা সোয়েটার পরে আসে।

শীতের সময় অনেকে নানা রকম চাদরও গায়ে দেন। কোনোটা মোটা উলের। কোনোটা খুব সরু উলের। দেখে বোঝা যায় না যে উল দিয়ে বোনা।

বড়োঠাকুমা বলেছিলেন, ওদেঁর ছোটোবেলায় দু-একজনের সোয়েটার ছিল। এক ডাক্তারবাবু ছিলেন। কোর্ট আর প্যান্ট পরতেন সাহেবদের মতো। পাড়ার অন্য লোকেরা শীতে চাদর গায়ে দিত। কেউ কেউ দু-তিনটে জামা পরত।

বৈশাখী, দিদিমণিকে বলল— দিদি, এখন কি আগের চেয়ে বেশি সোয়েটার পাওয়া যায়? দিদিমণি বললেন—

সুতনা বলল — সিন্থেটিক উল কী থেকে তৈরি করে?

দিদি বললেন — খনিজ তেল থেকে।

তারপর আবার বললেন — বর্ষাকালে যে বর্ষাতি পরো সেটা সিন্থেটিক।

বর্ষাকালে অনেকেই সিন্থেটিক শাড়ি পরেন। তাড়াতাড়ি শুকোয়, কাঁচলে কোঁচকায় না। সেগুলোও ঐ ধরনের তেল থেকে তৈরি হয়।

ওয়াসিম বলল— গরমের সময় পরার জন্য সুতির কাপড় ভালো, তাই না?

— ঠিক বলেছ। তাহলে পোশাক তৈরির নানারকম উপাদান বিষয়ে জানা গেল। কোনটা কোন ঋতুতে পরার জন্য, তা বুঝেছো?

নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও

ক. শীতকালে আমরা কী কী পোশাক পরি?
উত্তর ঃ- সোয়েটার, চাদর ইত্যাদি।

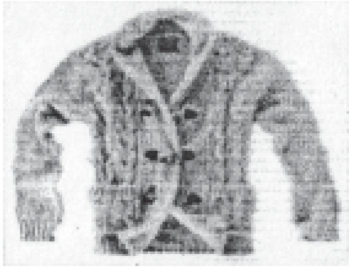

খ. সিন্থেটিক উল কী থেকে তৈরি হয়?
উত্তর ঃ- খনিজ তেল থেকে।

গ. বর্ষাকালে আমরা কী কী পরি?
উত্তর ঃ- বর্ষাতি, সিন্থেটিক কাপড় ইত্যাদি।

দলে বলাবলি করে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও

বর্ষাকালে সিন্থেটিক শাড়ি পরা ভালো কেন?
উত্তর — তাড়াতাড়ি শুকায়, কাচলে কোঁচকায় না।

'ঋতু' ও 'পোশাক' শব্দদুটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ঋতু — SEASON পোশাক — DRESS.

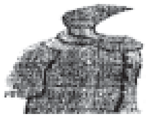

নিজের ভাষায় (দলে আলোচনা করে) উত্তর দাও

ক. গরমের সময় পরার জন্য কীসের কাপড় ভালো?

খ. নীচের ছকটি পূরণ করো —

পোশাকের নাম	কোন্ ঋতুতে পরা হয়	কেন ওই ঋতুতে পরা হয়	পোশাকের ছবি

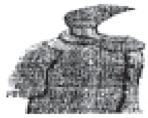

গ. কোন ঋতুতে আমরা ছাতা ব্যবহার করি?

ঘ. চাদর ব্যবহৃত হয় (গ্রীষ্ম/শীত) ঋতুতে।

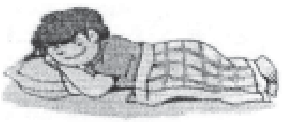

ঙ. বর্ষাতি কোন ঋতুতে পড়া হয়?

সমাপ্ত

সারসংক্ষেপ

- কম্পিউটারের মাধ্যমে শিখন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিত্তিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। যেমন — CAL, CAI, CMI, CBT ইত্যাদি।
- CAL -এর ব্যবহার প্রসারিত হয় প্রোগ্রাম লার্নিং-এর ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে।
- কম্পিউটারের সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়ায় মূলত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার হয় — লোগো, সিমুলেশন এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।
- CAL -এর মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ তৈরির জন্য যেসমস্ত মোড ব্যবহার হয় সেগুলি হল — টিউটোরিয়াল মোড, ড্রিল ও প্র্যাকটিস মোড, সিমুলেশন মোড, ডিসকভারী মোড এবং গেমিং মোড।
- মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষকের পরিবর্ত হিসাবে কম্পিউটার বা কোনো যন্ত্র কখনই সেই স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

CAL, LOGO, PLATO.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) CAL বলতে কী বোঝ?

(২) CAL দ্বারা শিখনের তিনটি পদ্ধতি কী কী? বিশদে আলোচনা করো।

(৩) কম্পিউটারের সাহায্যে শিখনের জন্য শিখন সহায়ক বস্তু প্রস্তুত করার জন্য যে মোডগুলি ব্যবহার করা হয় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।

(৪) CAL এবং CAI -এর মধ্যে পার্থক্যগুলি কী কী?

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষার উপর একটি CAL মেটেরিয়াল প্রস্তুত করো (কমপক্ষে ৮টি স্লাইড)।

(২) উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের উপর একটি CAL মেটেরিয়াল প্রস্তুত করো (কমপক্ষে ৮টি স্লাইড)।

(৩) কালচারাল অ্যাক্টিভিটির উপর একটি CAL মেটেরিয়াল প্রস্তুত করো।

অধ্যায়
৭

ওয়েবভিত্তিক শিখন

7.1 সূচনা (Introduction)

বর্তমান যুগ হল তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনধারাকে ক্রমশ উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। ইন্টারনেট পরিসেবা বা প্রয়োগগুলির মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবই সবথেকে বেশি ব্যবহৃত, জনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) সংক্ষেপে WWW নামে অধিক পরিচিত। ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকা লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের একত্রীকৃত তথ্যাদি অ্যাকসেস করার জন্য স্থাপত্যই (architectural framework) হল WWW, যা কেবলমাত্র "The Web" নামেও পরিচিত। এককথায় বলা যায়, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক কম্পিউটারে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ ফাইলের সমাবেশই হল "The Web"। এই ফাইলগুলিতে টেক্সট (text), ছবি (picture), স্থির ও চলমান চিত্র (video), শব্দ (sound) এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামসমূহ স্টোর থাকতে পারে।

আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগে একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ওয়েবভিত্তিক শিখন। আর এই ওয়েবভিত্তিক শিখনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষা পদ্ধতির, পাঠক্রমের এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর। ওয়েবের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি পরিমাণে তথ্য পেতে পারেন এবং পরীক্ষার জন্য অনলাইন ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। CAL, CAI, CMI প্রভৃতির ব্যবহার অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব কিছুর মূলে রয়েছে ওয়েবের ব্যবহার। Web এর ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই দ্রুততার সঙ্গে শিখতে পারে তেমনই অন্য দিকে সেই শিক্ষা স্থায়ী হয়।

এই অধ্যায়টি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে ঃ

- ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে।
- ইন্টারনেটের প্রাথমিক বিষয়গুলি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জানা যাবে।
- শিখন পদ্ধতিতে ওয়েবের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যাবে।
- তথ্য বিনিময় ও ই-মেল এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।
- পাসওয়ার্ড এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে।

৭.২ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web)

১৯৮৯ সালে **টিম বানার্স লি** নামক একজন পদার্থবিজ্ঞানী WWWর ধারণা দেন এবং তাকেই WWW এর জনক বলা হয়। এরপর ১৯৯১-এ WWW প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। WWW হাইপার টেক্সট ও হাইপার মিডিয়ার মাধ্যমে কার্যকরী হয়। ১৯৯৩ সালে প্রথম ওয়েব ব্রাউজারের ব্যবহার শুরু হয়। এই ওয়েব ব্রাউজারগুলি হল—ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer) গুগল ক্রোম (Google Chrome), মোজিলা ফায়ারফক্স (Mozilla Firefox) ইত্যাদি।

WWW হল একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারনেট পরিসেবা। WWW হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল (Hypertext Transfer protocol) ব্যবহার করে একটি তথ্যের সাথে অপর তথ্যের লিংক অথবা সংযোগ সাধন করে। ওয়েবের বাংলা প্রতিশব্দ হল মাকড়সার জাল। সারা বিশ্বব্যাপী মাকড়সার জালের মতই বিস্তৃত এই WWW এবং এই সংযোগ স্থাপন করা হয় বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে। অর্থাৎ WWW হল সার্ভারের একটি সিরিজ যেখানে সার্ভারগুলির নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টার কানেকশন থাকে। হোস্ট কম্পিউটার ব্যবহারকারী ব্রাউজিং করে নিজস্ব ISP সার্ভারের মাধ্যমে তথ্য বা ডাটা, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি তার নিজের কম্পিউটারে দেখতে বা ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনে ডাউনলোড বা আপলোডও করতে পারে।

৭.২.১ WWW এর গঠনমূলক ধারণা (Conceptual Framework of WWW)

পূর্বের আলোচনা থেকে WWW সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেছে। এখানে WWW কীভাবে কাজ করে সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। আগেই জানা গেছে এটি ইন্টারনেটের অংশ এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে কাজ করে Request এবং Reply পদ্ধতির মাধ্যমে। এখানে ব্যবহারকারী তার কারেন্ট সার্ভারের কাছে প্রয়োজনীয় রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং সার্ভার সেই রিকোয়েস্টের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রেসপন্স দেয়। এক্ষেত্রে সার্ভার থেকে প্রয়োজনীয় রেসপন্স পাবার পর ক্লায়েন্টের সাথে সার্ভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে প্রোটোকলের মাধ্যমে WWW এর এই Request ও Reply পদ্ধতিটি সংগঠিত হয় তাকে HTTP (Hypertext Transfer Protocol) বলা হয়।

একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল। ধরা যাক, একজন ইউজার কোনো ওয়েব ব্রাউজারে www. google.com লিখে Enter প্রেস করেছেন। এখানে www. google.com হল একটি URL। URL এর পুরো নাম হল Uniform Resource Locator। এক্ষেত্রে Request ⇆ Reply কীভাবে সংগঠিত হয় তা নীচে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

(i) ওয়েব ইউজারের লেখা URL রিসিভ করে।

(ii) এরপর ব্রাউজার DNS (Domain Name Server) এর কাছে নির্দিষ্ট URL অর্থাৎ www. google.com এর IP অ্যাড্রেস জানতে চায়।

(iii) ব্রাউজারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় Request পাবার পর DNS নির্দিষ্ট IP অ্যাড্রেসটিকে Reply হিসেবে ব্রাউজারকে পাঠায়।

(iv) এরপর ব্রাউজার TCP (Transmission Control Protocal) এর মাধ্যমে ওই অ্যাড্রেসে সংযোগসাধন করে।

(v) ব্রাউজার সার্ভারের কাছে GET কমান্ড পাঠায়।

(vi) সার্ভার ব্রাউজারের কাছে প্রয়োজনীয় রেসপন্স পাঠায়।

(vii) ব্রাউজারের সাথে TCP এর সংযোগ এবার বিচ্ছিন্ন হয়।

(viii) এবার ব্রাউজার পেজের মধ্যে যে তথ্য আছে তা প্রদর্শন করে।

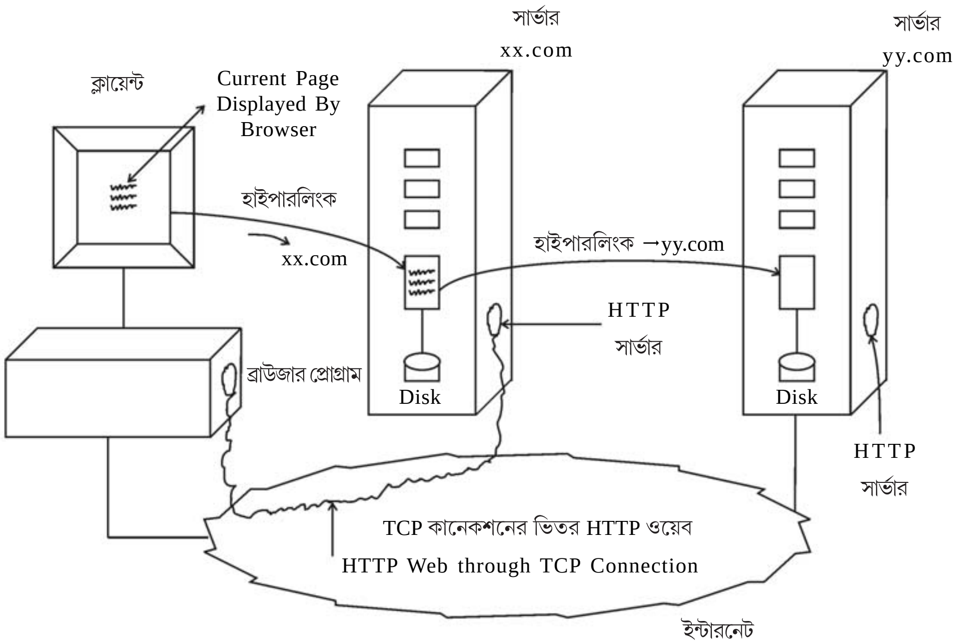

চিত্র ৭.১ : ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে তথ্য প্রদর্শন

উপরোক্ত ছবিতে ব্রাউজারের মাধ্যমে কীভাবে পেজের মধ্যে তথ্য প্রদর্শন করা হয় তা দেখানো হয়েছে।

৭.৩ ইন্টারনেটের প্রাথমিক বিষয়সমূহ (Fundamentals of Internet)

দুই বা ততোধিক মেশিন একত্রে যুক্ত হয়ে যখন পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য আদান-প্রদান করে, তখন সেই ব্যবস্থাকে নেটওয়ার্ক বলা হয়। নেটওয়ার্ক যখন গেটওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী (World Wide) যোগাযোগ পরিসেবার (Communication services) সুবিধা দেয়, তখন সেই সিস্টেমকে ইন্টারনেটওয়ার্ক (Internetwork) বা সংক্ষেপে ইন্টারনেট (Internet) বলা হয়।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর ১৯৬৯ সালে সরকারি সৌজন্যে গবেষণা নেটওয়ার্ক ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) তৈরি করেন। এই ARPANET-কেই বলা হয় প্রথম ইন্টারনেট। এরপর ১৯৭০ সালে Networking Group বা NWG তৈরি করে NCP (Network Communication Protocol), কারণ এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় প্রতিদিনই অনেক কম্পিউটার যুক্ত হচ্ছিল। ১৯৭২ সালে প্রথম ই-মেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়। ১৯৭৩ সালে আরপানেট সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো যার সূচনা হয়েছিল নরওয়ে থেকে ইংল্যান্ডে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে। এই সময় ইন্টারনেটে FTP (File Transfer Protocol) ব্যবহৃত হতো তথ্য আদান প্রদানের জন্য। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) অফিসিয়াল প্রোটোকলের স্বীকৃতি পায় ইন্টারনেটে তথ্য আদান প্রদানের জন্য। ১৯৮৪ সালে DNS ব্যবস্থার শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০০নেটওয়ার্ক এবং২,০০,০০০ কম্পিউটার ইন্টারনেটে যুক্ত হয়। এরপরেই সাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয় World Wide Web। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ইন্টারনেটের একটি সাধারণ রূপ হল WAN (Wide Area Network), এর দ্বারা সংযুক্ত LAN (Local Area Network) সমূহের সংগ্রহ চিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হয়েছে ঃ

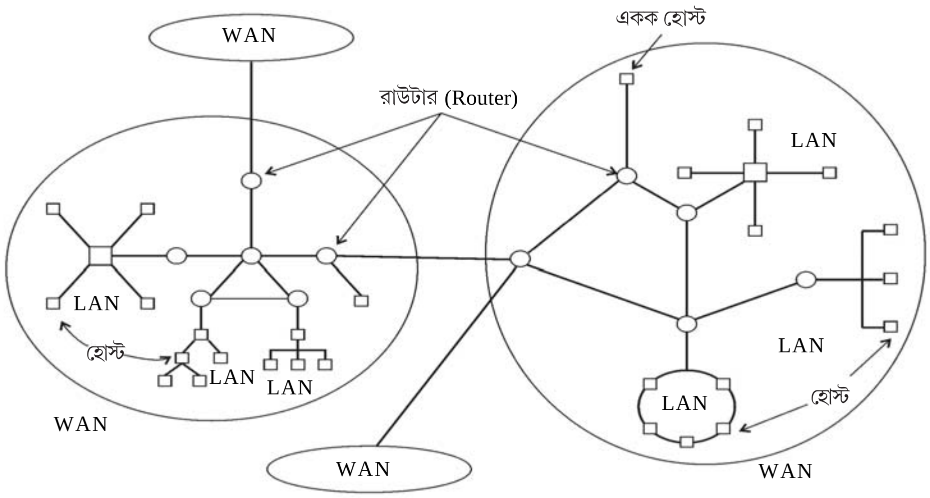

চিত্র ৭.২ : একটি সাধারণ ইন্টারনেট কানেকশন

ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ওয়েব পেজে (Web Page) বিবিধ তথ্য সঞ্চিত হয় এবং উক্ত ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থা সেই তথ্য অ্যাকসেস করতে পারে (অর্থাৎ পড়তে পারে) এবং প্রয়োজনে নিজ মেশিনে ডাউনলোডও করতে পারে।

৭.৩.১ ইন্টারনেটে ব্যবহৃত কয়েকটি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা (Some Fundamental Concepts used in Internet)

কম্পিউটারের মাধ্যমে ইউজার (user) যদি ইন্টারনেট পরিসেবা পেতে চায় তাহলে কম্পিউটারের মধ্যে কিছু হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার থাকা আবশ্যক। প্রসঙ্গত বলা যায়, যে সকল সংস্থার মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিসেবা পাওয়া যায় তাদের বলা হয় Internet Service Provider (ISP)। ISP রাউটারের (Router) মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিসেবা প্রদান করে। কোনো তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে সমস্ত কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় তাদের বলা হয় সার্ভার (Server)। ইন্টারনেট পরিসেবা পাওয়ার জন্য যে সমস্ত হার্ডওয়ার বা সফটওয়ারগুলি প্রয়োজন হয় সেগুলি নীচে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

মোডেম (Modem) ঃ মোডেম কথাটি হল মডুলেটার এবং ডি-মডুলেটারের (Modulator & Demodulator) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আসলে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখন অন্য একটি কম্পিউটারের সংযোগ সাধন করা হয় তখন ওই সংযোগ ব্যবস্থা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল হল কম্পিউটার চলে ডিজিটাল সিগন্যালের মাধ্যমে, আর টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান হয় অ্যানালগ অর্থাৎ PSTN (Public Switched Telephone Network) পদ্ধতিতে। এই দুটি পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতেই প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ যন্ত্র যার মাধ্যমে অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে এবং ডিজিটালকে অ্যানালগ সিগন্যালে পরিবর্তন করা যায়। মোডেম হল এইরূপ একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। যার প্রধান কাজ হল টেলিফোন থেকে আসা সংকেতকে (অ্যানালগ) কম্পিউটারের বোধ্য ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তিত করা এবং কম্পিউটারের ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগে রূপান্তরিত করা। মোডেম সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে: এক্সটারনাল এবং ইন্টারনাল। এক্সটারনাল মোডেমকে প্রয়োজনমতো খুলে অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় যেহেতু এটি কম্পিউটার সিস্টেমের বাইরে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু ইন্টারন্যাল মোডেম কম্পিউটার সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে বসানো থাকে। মোডেমের গতি নির্ভর করে প্রতি সেকেন্ডে কতটা পরিমাণ ডেটা বা তথ্য পাঠানো যায় তার উপর।

চিত্র ৭.৩ : মোডেম

কম্পিউটার ঃ ইন্টারনেট পরিসেবা পাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল একটি কম্পিউটার। ভালো পরিসেবা পাওয়ার জন্য কম্পিউটারে বেশি হার্জযুক্ত প্রসেসর এবং বেশি RAM র প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ঃ অনেক সময় মোডেম এবং কম্পিউটার সিস্টেমের সংযোগ স্থাপন করার জন্য তার ড্রাইভার সফটওয়ার ইনস্টল করার প্রয়োজন হয়। আর প্রয়োজন হয় ব্রাউজিংয়ের জন্য ব্রাউজার বা সার্চ ইঞ্জিন, যেটি একটি সফটওয়ার প্রোগ্রাম।

ব্রাউজার ঃ ব্রাউজার হল এক বিশেষ ধরনের সফটওয়ার প্রোগ্রাম যার সাহায্যে খুব সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধানের কাজ করা যায়। যেমন—কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে করতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো ওয়েব পেজে গিয়ে, আবার আগের বিষয়ে বা পেজে ফিরে আসা ইত্যাদি কাজগুলি করা যায় ব্রাউজারের সাহায্যে। ব্রাউজারের প্রধান কাজ ব্যবহারকারীর কাছে তথ্যের উৎস সরবরাহ করা। যখন ইউজার ব্রাউজারের মাধ্যমে কোনো ইউনিফর্ম রিসোর্স আইডেনটিফায়ার (URL) কে যুক্ত করেন তখনই ব্রাউজারের কাজ শুরু হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি URL হল http://scertwb org। এই URL টির দুটি অংশ, প্রথম অংশটি হল http এবং দ্বিতীয় অংশটি হল scertwb.org যারা পরস্পরের সহিত :// সংকেত দিয়ে বিভক্ত। প্রথম অংশটির অর্থ হল যে এক্ষেত্রে তথ্য (information) কেবলমাত্র Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ব্যবহার করেই সংগ্রহ করা যাবে। যেহেতু ইন্টারনেট একটি হারপার মিডিয়া (Hyper media), এখানে Hyper Text Markup Language (HTML) ব্যবহার করা হয়। কাজেই হাইপার টেক্সট ফরম্যাটে লেখা তথ্য আদান প্রদানের জন্য, ওয়েব ব্রাউজারকে Hypertext transfer protocol (http) ব্যবহার করা আবশ্যক। CSS (Cascading Style Sheets) হল আর একটি প্রোটোকল যার সাহায্যে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েবে গ্রাফিকাল ইন্টারফেস ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের ব্রাউজার হল Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Opera ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ scertwb.org ডোমেনের (Domain) নাম বোঝায়।

সার্চ ইঞ্জিন ঃ সার্চ ইঞ্জিন হল একটি টুল যা WWW তে সঞ্চিত তথ্য খোঁজার কাজে ব্যবহার করা হয়। খোঁজার পর তথ্যগুলি একটি তালিকার মতো উপস্থাপিত হয় যেটিকে বলা হয় hits। প্রথম সার্চ ইঞ্জিন প্রস্তুত করেন 'অ্যালান এমটেজ' (Alan Emtage) ১৯৯০ সালে এবং এই সার্চ ইঞ্জিনের নাম ছিল 'Archie'। এরপর ১৯৯১ তে আসে Gopher সার্চ ইঞ্জিন। বর্তমানে আরো নানা ধরনের সার্চ ইঞ্জিন আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হল — Netscape, yahoo, Google, MSN ইত্যাদি। সার্চ ইঞ্জিনগুলো তিনটি ধাপে কাজ করে— ওয়েব ইনডেক্সিং (Web Indexing), ক্রলিং (Crawling) এবং সার্চিং (Searching)।

সার্চ ইঞ্জিন ওয়েব পেজের তথ্য সংগ্রহ করে জমা রাখে এবং তারপরে এই তথ্যগুলি html এর মাধ্যমে ইউজারের কাছে পৌঁছে দেয়। ওয়েবপেজগুলো সংগৃহীত হয় ওয়েব ক্রলারের সাহায্যে। অনেক সময় এই ক্রলারগুলোকে 'স্পাইডার' বলা হয়। ওয়েব পেজের প্রত্যেকটি পেজ বিশ্লেষণ করে কিভাবে সূচী বা তালিকা তৈরি করা হবে তা নির্ধারণ করাকেই বলা হয় ইনডেক্সিং। যখন কোনো ব্যবহারকারী সার্চ ইঞ্জিনে কোনো তথ্য অনুসন্ধান করেন, তখন সার্চ ইঞ্জিন তার ইনডেক্স এ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে

এবং একটি তালিকা তৈরি করে ব্যবহারকারীকে দেয়। তবে প্রত্যেক সার্চ ইঞ্জিনের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা সে ঠিক করে কোন্ তথ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌টি কম গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাউজিং বা সার্ফিং ঃ ব্রাউজিং বা সার্ফিং কথার অর্থ হল অনুসন্ধান করা বা খোঁজা। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ডাটা বা তথ্য অনুসন্ধান করাই হল নেট সার্ফিং। কোনো ব্রাউজারকে কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ দিলে ব্রাউজার তথ্যের তালিকা দেয়। এই তালিকার সাহায্যে ইন্টারনেটে তথ্য বার করাই হল নেট সার্ফিং। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগল ক্রোম, মোজিলা ফায়ারফক্স ইত্যাদি সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে সার্ফিং করা যায়।

৭.৪ ইন্টারনেটের ব্যবহার (Uses of Internet)

বর্তমানে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার বিভিন্ন কাজে নানা সুবিধা এনে দিয়েছে। নীচে ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বিবিধ শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। নানা বিষয়ের ওপর তথ্য, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ওয়েবসাইট সার্চ করে খুব সহজেই পাওয়া যায়। দেশবিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেট আমাদের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অনলাইন অ্যাডমিশনের (On Line admission) ক্ষেত্রে ফর্ম ফিলাপ (Form Fill up), ফর্ম সাবমিশন (Form submission) ইত্যাদি ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুত করা সম্ভব। শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমন GRE, CAT) অংশ নিতে পারে এবং পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারে।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ঃ আমাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রায় সমস্ত জিনিসই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে কেনাকাটা করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে পণ্যসামগ্রী কেনাবেচা সম্ভব। এই ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য ই-কমার্স নামে পরিচিত। রেল ও বিমানের টিকিট কাটার জন্য এবং কোনো হোটেলের রুম বুকিংয়ের জন্য ইন্টারনেট একটি সাহায্যকারী মাধ্যম। বীমার প্রিমিয়াম, ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোনের বিল ইত্যাদি ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে জমা করা যায়। ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কের অনেক কাজই ঘরে বসেই খুব সহজে সম্পন্ন করা যায়। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের বাণিজ্যের প্রসারের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে ওয়েব পেজের (web page) মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রির বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করতে পারে।

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ঃ ইন্টারনেট যোগাযোগের একটি দ্রুত, সস্তা এবং জনপ্রিয় মাধ্যম। ই-মেল এর মাধ্যমে খুব কম সময়ে এবং কম খরচে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য, মেসেজ, ফাইল ইত্যাদির আদান প্রদান করা যায়। এক্ষেত্রে প্রেরক এবং প্রাপক উভয়েরই একটি করে ই-মেল অ্যাড্রেস (e-mail address) থাকা প্রয়োজন হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের আর একটি সহজ উপায় হল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং (Instant Messaging)। ইন্সট্যান্ট মেসেজিং ইন্টারনেটের এমন একটি সার্ভিস যার মাধ্যমে একজন ইউজার (User) অপর এক বা একাধিক ইউজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ (real time communication) স্থাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু টেক্সট মেসেজ নয়, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির আদান প্রদান করা যায় এবং ভয়েস বা ভিডিও চ্যাটিং করা যায়। Whatsapp হল একটি জনপ্রিয় ইন্সট্যান্ট মেসেনজার। ইন্টারনেটে সোস্যাল নেটওয়ার্কের (twitter, facebook) মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তেমনই নতুন বন্ধুত্বও গড়ে তোলা যায় এবং নিজস্ব মতামতও জানানো যায়। এগুলি ছাড়াও ইন্টারনেটের সাহায্যে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম হল ইন্টারনেট টেলিফোনি (Internet Tele-phony), ওয়েব কনফারেন্সিং (Web conferencing) ইত্যাদি।

বিনোদনে ঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট বিনোদনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনলাইনে বিভিন্ন গেম্ খেলা, গানশোনা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ইন্টারনেটে। বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে নিখরচায় বা সামান্য খরচে গান, ভিডিও, গেমস ইত্যাদি ডাউনলোড করা যায়। বিভিন্ন বইয়ের ইন্টারনেট সংস্করণ

অনলাইনে পড়া যায় বা অনেক ক্ষেত্রে ডাউনলোডও করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাইট থেকে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও দেখে নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

সরকারি কাজকর্মে ঃ বিভিন্ন সরকারি দফ্‌তরের কাজকর্মে ইন্টারনেটের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রায় সমস্ত সরকারি বিভাগের (Department) নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যাদি, বিভিন্ন সরকারি কাজের অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে ঘরে বসেই অবগত হওয়া যায়। এর ফলে সরকারি কাজকর্মের স্বচ্ছতাও যেমন বেড়েছে তেমনি সাধারণ মানুষও বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারছে। উদাহরণস্বরূপ, পাসপোর্টের জন্য আবেদন, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া সবই ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজ ও তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ইন্টারনেটের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের কাজকর্মের আরও সমন্বয় সাধন করতে পারছে।

৭.৪.১ ইনফরমেশন ডাউনলোডিং (Information Downloading)

আজকের যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তথ্যের ভূমিকা আজ অপরিসীম। তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে তথ্য আহরণ ও তার ব্যবহার খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশু শিক্ষায় এবং শিশুর বিকাশে ইন্টারনেটের ব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশাল তথ্যভাণ্ডার আজ আমাদের হাতের নাগালে। এই বিপুল তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষণ শিখনের সমস্ত স্তরেই তা ব্যবহার করার ফলে পাঠ্যবইয়ের সীমিত গন্ডিকে সহজেই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে শিক্ষকের ক্ষেত্রেও আজ শিশুমনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি কৌতূহল নিবৃত্ত করা সহজসাধ্য হয়েছে। আর এ সমস্ত কিছুই একটি শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তা পাঠ্য বিষয় উপযোগী করে উদাহরণ ও যথাযথ ব্যাখ্যা সহযোগে শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে পারলে তবেই বিষয়বস্তু আরও সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। এই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষকের।

ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ইউসারের (User) কম্পিউটারে স্থানান্তরিত করাকেই ডাউনলোড (download) বলা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য ডাউনলোড করা হয় তা সঠিকভাবে সঞ্চয় করে রাখতে হয় ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। ইন্টারনেট থেকে তথ্য ডাউনলোড করার পদ্ধতি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

- প্রথমে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মোজিলা ফায়ার ফক্স, গুগল ক্রোম বা এই জাতীয় কোনো ওয়েব ব্রাউজার ওপেন (open) করতে হবে।
- যে ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তার অ্যাড্রেস জানা থাকলে ওয়েব ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বক্সে ওই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস টাইপ করে Enter key প্রেস করতে হবে বা Go বাটনে ক্লিক করতে হবে। তাহলেই ওয়েব সাইটটি খুলে যাবে এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
- ওয়েবসাইট বা পোর্টালের সঠিক অ্যাড্রেস জানা না থাকলে অবশ্যই গুগল বা এই জাতীয় কোনো সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক কোনো একজন ইউজার (user) পশ্চিমবঙ্গের National Council for Teacher Education বা NCTE দ্বারা স্বীকৃত teacher education প্রতিষ্ঠান কোনগুলি তা জানতে চায়। কিন্তু ইউজারের ওয়েব অ্যাড্রেস জানা নেই। এক্ষেত্রে কোনো ওয়েব ব্রাউজার ওপেন (open) করে কোনো সার্চ ইঞ্জিন যেমন গুগুলের অ্যাড্রেস অর্থাৎ www. google.com লিখে Enter key প্রেস করলে গুগুলের হোম পেজ (Home page) খুলে যাবে। সার্চ বক্সে (Search Box)-এ National Council for Teacher Education টাইপ করে google search বাটনে ক্লিক করতে হবে বা Enter key প্রেস করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার স্ক্রিনের প্রথমেই NCTE : National Council for Teacher Education এবং তার ওয়েব অ্যাড্রেস

www. ncte-india.org প্রদর্শিত হবে। এই নামের ওপর মাউস ক্লিক করলে NCTE-র ওয়েবসাইটটি খুলে যাবে। এবার এই ওয়েবসাইট থেকে Recognised Institutes'' লিঙ্ক-এ ক্লিক করলে Recognised Institutions এই পেজটি খুলে যাবে। এই ওয়েব পেজে Eastern Regional Committee র অন্তর্ভুক্ত Recognized Institution's List কলামের ''I Agree'' লিংক-এ click করলে List of Recognized Teacher Education Institutions (Eastern Region) পেজটি খুলে যাবে। এখানে Eastern Region-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে West Bengal এর ওপর মাউস ক্লিক করলে West Bengal এর D.EI.Ed, B.Ed., M.Ed., B.P.Ed এবং M.P.Ed এই Teacher Education Course গুলির নামসহ আর একটি পেজ খুলবে। এখন D.EI.Ed-এর ওপর ক্লিক করলে পশ্চিমবঙ্গের NCTE স্বীকৃত D.EI.Ed কলেজগুলির নাম ও Recognition সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

৭.৪.২ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে ওয়েবের ব্যবহার (Uses of Web in Teaching Learning Process)

শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়েবের ব্যবহার শুধু জনপ্রিয় নয় অনেকক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। ওয়েব, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের আদান প্রদান ও তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন এক বিপ্লব এনেছে যা শিক্ষণ-শিখনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। অন্য কথায় বলা যায় শিক্ষণ-শিখনে ওয়েবের ব্যবহারের ফলে গুণগত এবং পরিমাণগত উৎকর্ষ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়েবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মাল্টিমিডিয়া এবং হাইপারটেক্সট এর ব্যবহার। তথ্যের উপস্থাপনে মাল্টিমিডিয়ার হাইপার টেক্সট, হাইপার লিংক এবং অটোমেটিক সার্চ ওয়েবকে আরও অনেক বেশি মাল্টিমিডিয়া নির্ভর করে তুলেছে। প্রথাগত বই নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার কোনো বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে যতটা আকর্ষণীয় সেই একই বিষয় যখন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ টেক্সট, ছবি, অ্যানিমেশন, শব্দ ইত্যাদির সমন্বয়ে উপস্থাপিত করা হয় তখন তা শিক্ষার্থীর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানুষের কাছে সেই শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প ওয়েবই।

স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরাচরিত লেকচার প্রথায় শিক্ষাদান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। এই ব্যবস্থায় সকল স্তরের শিক্ষার্থীর সার্বজনীন অংশগ্রহণ ও সার্বিকভাবে সম্ভবপর হয় না। কোনো শিক্ষার্থী তার পঠন পাঠনের বা গবেষণার উপযোগী তথ্যাবলী যেমন ওয়েব থেকে খুঁজে নিতে পারে তেমনই ওয়েব দূরশিক্ষার (Distance Education) মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত সহায়ক। দূরশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বিভিন্ন কোর্সের সিলেবাস, নোট, লেকচার ইত্যাদি নিজ নিজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে যদি e-learning-র ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষার্থী অনলাইন লেকচার (online lectures) এবং ওয়েব বেসড্ ট্রেনিংয়ে (Web Based Training বা WBT) অংশ নিতে পারে। এই ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভার্চুয়াল ইউনিভারসিটি (Virtual University) তৈরি হয়েছে। ভার্চুয়াল ইউনিভারসিটিতে ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি (physically) কোনো ক্লাসে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন পড়ে না। মাল্টিমিডিয়া, হাইপারমিডিয়া এবং তথ্য প্রযুক্তির সংমিশ্রণে অফ্ ক্যাম্পাস টিচিং (Off-Campus Teaching) আজ ভার্চুয়াল টিচিং-এ পরিবর্তিত হয়েছে। ভার্চুয়াল ক্লাসে (Virtual Class) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মতের আদান-প্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেক দ্রুত সম্ভব হয়।

বর্তমানে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী বিভিন্ন OER বা Open Educational Resources নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, OER হল শিক্ষণ, শিখন এবং গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিসোর্সেস (Resources) যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওয়েব থেকে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনমত ব্যবহার ও শেয়ার করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে Central Institute of Educational Technology (CIET), NCERT এবং ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে তৈরি National Repository of Open Educational Resources বা NROER চালু হয়েছে১৩ই আগস্ট ২০১৩ হতে। এই ভান্ডার বা Repository তে স্থান পেয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রিসোর্স। প্রাথমিকভাবে এই তথ্যাবলী ইংরেজি ও হিন্দিতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও খুব শীঘ্রই এই রিসোর্স পাওয়া যাবে। তাছাড়া রাজ্য স্তরেও Repository তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে যা জাতীয় Repository র সঙ্গে যুক্ত করা হবে। NROER এর ওয়েব অ্যাড্রেস হল nroer.in। ওয়েবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল News group। News group হল একটি ইন্টারনেট discussion forum

যেখানে সদস্যরা (member) কোনো একটি বিষয়ের ওপর বার্তা আদান প্রদান করতে পারে। টেকনিক্যাল এবং নন্ টেকনিক্যাল বিষয়ক হাজার হাজার Newsgroup আছে, যার সদস্যরা কোনো একটি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও Newsgroup এর একজন সদস্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা আর্টিক্‌ল পড়তে বা ডাউনলোড করতে পারে এবং নিজের আর্টিক্‌ল post করতে পারে। Newsgroup এর মাধ্যমে একজন সদস্য শুধু বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞান আহরণ করতে পারে তাই নয়, বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার মতামত প্রদানও করতে পারে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর অন্যতম জনপ্রিয় প্রয়োগগুলির মধ্যে একটি হল পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থা যা USENET নামে পরিচিত।

শিক্ষকেরা বিভিন্ন ওয়েব রিসোর্স ব্যবহার করে শিক্ষণ শিখনের যে সমস্ত কাজগুলি করতে পারে তা হল—

(ক) পাঠক্রম তৈরি করা।

(খ) পাঠ পরিকল্পনা করা।

(গ) অভীক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগ করা।

(ঘ) মূল্যায়ন করা।

(ঙ) নির্দেশ দান ও শিক্ষণ।

৭.৪.৩ যোগাযোগ রক্ষায় এবং শিক্ষণ শিখন ব্যবস্থায় ই-মেল এর গুরুত্ব (Importance of e-mail in Communication and Teaching Learning System)

ই-মেল বা ইলেকট্রনিক মেল ইন্টারনেট পরিসেবাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত। ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে প্রেরিত ইলেকট্রনিক বার্তাই হল ই-মেল। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে এই ই-মেল পরিসেবার মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে সংস্থার বা সংস্থার সাথে ব্যক্তির কিংবা সংস্থার সাথে সংস্থার মধ্যে ইন্টারনেটের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হয়। এই তথ্য টেক্সট, ছবি হতে পারে, আবার অডিও ভিডিও হতে পারে। ই-মেল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দূরত্ব কোনো বাধাই নয়। প্রেরক ও প্রাপক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকুন না কেন প্রেরকের বার্তা অতি দ্রুত প্রাপকের কাছে পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রেরক ও প্রাপকের কম্পিউটারকে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং উভয়েরই ই-মেল অ্যাড্রেস (e-mail address) থাকতে হবে। ই-মেল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে ।

ই-মেল ব্যবহারের সুবিধা ঃ

(ক) ই-মেলের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো খুবই সহজ এবং এটি অত্যন্ত দ্রুত প্রেরণ করা যায়।

(খ) ই-মেল প্রেরণের খরচ খুবই কম।

(গ) প্রেরিত তথ্য প্রাপকের কাছে ঠিকমত পৌঁছেছে কি না তা সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, যদি না পৌঁছায় তাহলে তা পুনরায় পাঠানো সম্ভব।

(ঘ) প্রাপক যেখানেই থাকুন না কেন নিজের মেল বক্স (mail box) খুলে চিঠি পড়তে পারেন এবং উত্তর (Reply) পাঠাতে পারেন।

(ঙ) একই বার্তা একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে পাঠানো যায়। সেক্ষেত্রে বারবার লেখার প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র ই-মেল অ্যাড্রেস লেখার প্রয়োজন হয়।

(চ) পাসওয়ার্ড সুরক্ষা থাকায় ই-মেল বার্তা অনেক বেশি নিরাপদ। যে কেউ কম্পিউটারে বসে অন্যের মেল বক্স (mail box) খুলতে পারে না।

(ছ) দিন বা রাতের যেকোনো সময় ই-মেলের আদান প্রদান করা যায়।

(জ) ই-মেল বার্তার সাথে টেক্সট ফাইল, স্ক্যান করা কাগজ, ছবি কিংবা কোনো অডিও বা ভিডিও অ্যাটাচমেন্ট (Attachment) হিসাবে পাঠানো যায়।

(ঝ) প্রাপকের কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও তার মেল বক্স (mailbox)-এ বার্তা স্টোর হয়ে থাকে। সেজন্য মেল পাঠানোর সময় প্রেরককে চিন্তা করতে হয় না প্রাপক ঐ মুহূর্তে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত আছে কি না।

(ঞ) ই-মেলগুলি দীর্ঘদিন ধরে mail box (inbox)-এ সঞ্চয় করে রাখা যায়।

(ট) প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ই-মেল এর প্রিন্ট (Print) নেওয়া যায়।

ই-মেলের ব্যবহারের অসুবিধা ঃ

(ক) খুব বড়ো ই-মেল বার্তা বা বিশাল আয়তনের তথ্য অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে পাঠানো প্রায় অসম্ভব।

(খ) নেটওয়ার্ক সিস্টেমে সমস্যা থাকলে ই-মেল প্রেরণের গতি অনেক ধীর হতে পারে।

(গ) ই-মেলের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের সময় বিভিন্ন কম্পিউটার ভাইরাসের দ্বারা ইউজারের কম্পিউটার আক্রান্ত (affected) হতে পারে এবং কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে।

(ঘ) ই-মেল অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট (logout) না করলে অন্য কেউ সেটি অসদ্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

৭.৪.৩.১ ইমেল অ্যাড্রেস

সাধারণ চিঠিপত্র পাঠাতে যেমন একটি ঠিকানার প্রয়োজন হয় ঠিক সেরকমই ই-মেল প্রেরণ বা গ্রহণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস বা ঠিকানার প্রয়োজন হয়। একেই ই-মেল অ্যাড্রেস (e-mail address) বা সংক্ষেপে e-mail Id বলা হয়। অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে e-mail Id তৈরি করা যায়, যেমন—www.yahoo.com, www.rediffmail.com ইত্যাদি। এই ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহার করে বিনা খরচে e-mail Id তৈরি করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে e-mail Id-র প্রতিটি অক্ষর ইংরেজি ছোটো হাতের (lower case letter) হওয়া বাঞ্ছনীয়। e-mail Id হল একটি স্বতন্ত্র অ্যাড্রেস অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তির একই e-mail Id থাকতে পারে না। একটি সম্পূর্ণ e-mail Id-র দুটি অংশ বর্তমান। যথা—

(i) ইউজারের নাম (user name) ও

(ii) ডোমেনের নাম (Domain name)

উপরিউক্ত অংশ দুটি @ (অ্যাট বা at) চিহ্নের দ্বারা পৃথক করা হয়। ইউজার নেম (user name) ব্যক্তি বা সংস্থার পরিচিতি নির্দেশ করে যিনি মেলটির প্রেরক বা প্রাপক। ইউজার নেম অবশ্যই কোনো লেটার (letter) দ্বারা শুরু হয় এবং এর সাথে যেকোনো সংখ্যা, পিরিয়ড ও কিছু স্পেশাল ক্যারেকটার ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কোনো কমা বা স্পেস ইউজার নেমের মধ্যে ব্যবহার করা যায় না। ডোমেন নেম দ্বারা কম্পিউটার সিস্টেমটি নির্দেশিত হয় যেখানে ইউজারের অ্যাকাউন্ট আছে। অন্য কথায় এটি e-mail সার্ভিস প্রদানকারীর পরিচিতিজ্ঞাপক Id। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে roy_abir 1975@rediffmail.com হল একটি e-mail Id। এখানে roy_abir 1975 হল ইউজার নেম, rediffmail.com হল ডোমেন নেম এবং com হল ডোমেনের প্রকৃতি। কখনো কখনো ডোমেন নেমের পরে আবার ডট (.) দিয়ে কান্ট্রি কোড থাকতে পারে, যেমন arka2010@yahoo.co.in।

৭.৪.৩.২ ইমেলে ব্যবহৃত বিষয়সমূহ (Buttons/Options used in E-mail)

ই-মেল পেজ ওপেন করলে যে সমস্ত বাটনগুলি দৃশ্যমান হবে এবং ঐ সমস্ত বাটনগুলি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

- **New Message/Write/Compose ঃ** কোনো নতুন মেল লিখতে হলে ই-মেল সফ্‌টওয়্যারের মেনু বা টুলবার থেকে New Message/New Mail/Write/Compose ইত্যাদিতে ক্লিক করলে নিচের চিত্রের মতো একটি উইন্ডো খুলে যাবে। এখানে ইউজার (user) তার প্রয়োজন অনুযায়ী মেলের বিষয়বস্তু লিখতে পারে।

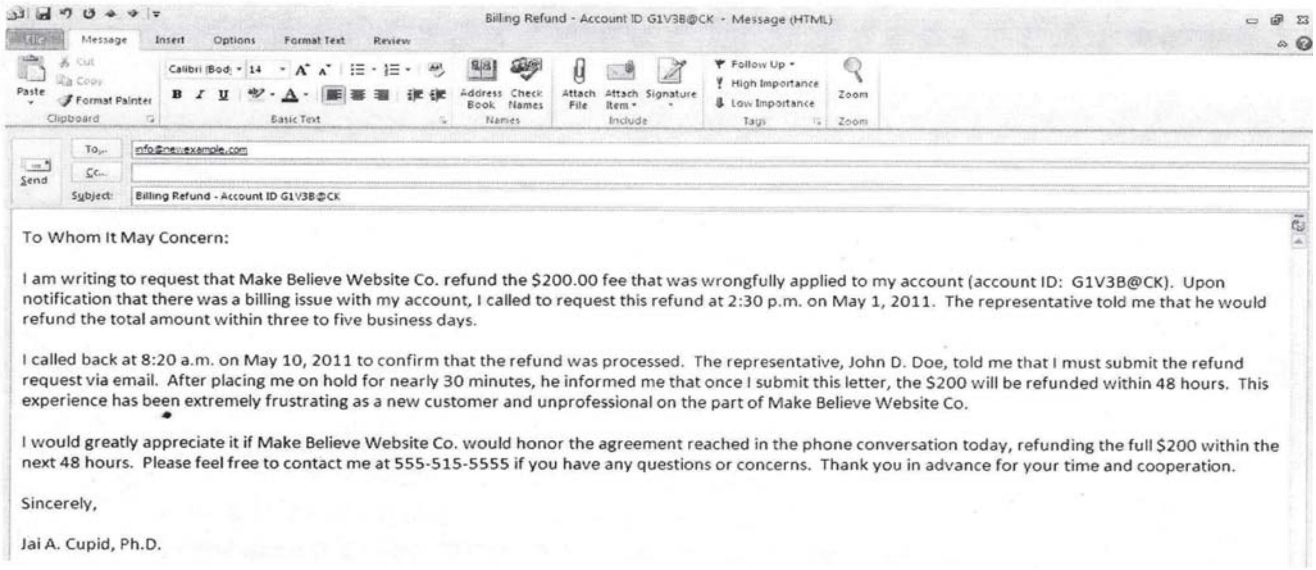

চিত্র ৭.৪ : ই-মেল পেজ বা উইন্ডো

- **TO** ঃ প্রাপকের ই-মেল অ্যাড্রেস এই ঘরে লিখতে হয়।
- **CC** ঃ এর পুরো কথাটি হল কার্বন কপি (Carbon Copy)। একটি মেল একাধিক প্রাপকের কাছে পাঠাতে হলে মুখ্য প্রাপকের e-mail Id টি TO ঘরে লিখে বাকিদের e-mail Id গুলি CC-ঘরে কমা দিয়ে পৃথক করে লেখা হয়।

- **BCC** ঃ এই শব্দের পুরো কথাটি হল ব্লাইন্ড কার্বন কপি (Blind Carbon Copy)। এখানেও একাধিক প্রাপকের e-mail Id সমূহ কমা দিয়ে লেখা হয়। তবে CC-তে যেমন প্রাপক তাকে ছাড়া আর যাদের একই ই-মেল পাঠানো হয়েছে তাদের অ্যাড্রেস দেখতে পায়, কিন্তু BCC-তে প্রাপক শুধু নিজের মেল অ্যাড্রেসটি দেখতে পায়।
- **Subject** ঃ এই ঘরে সংক্ষেপে ই-মেল বার্তার বিষয়বস্তু লেখা হয়।
- **Attachment** ঃ ই-মেলের সঙ্গে অন্য কোনো টেক্সট ফাইল, ছবি, স্ক্যান করা ডকুমেন্ট ইত্যাদি সংযুক্ত করে পাঠানো হলে তাকে অ্যাটাচমেন্ট বলে এবং এই ধরনের কোনো অ্যাটাচমেন্ট পাঠাতে হলে Attachment Option টি ব্যবহার করে পাঠানো হয়।
- **Send** ঃ মেল লেখার পর এই বাটনে ক্লিক করলে ই-মেল প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছে যায়।
- **Inbox** ঃ কোনো প্রাপকের কাছে আসা সমস্ত মেলগুলি এই স্থানে একটি তালিকা বা লিস্টের আকারে জমা হয়।
- **Outbox** ঃ একটি ই-মেল send করার সময় সেই মুহূর্তে কোনো কারণে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে তা outbox-এ জমা হয়। ইন্টারনেট সংযোগ চালু হলে outbox থেকে মেলগুলি পুনরায় send হয়ে যায়।
- **Sent Item** ঃ যে সকল মেল প্রাপকের কাছে পাঠানো হয়েছে সেগুলির একটি করে কপি এই বক্সে এসে জমা হয়।
- **Trash** ঃ Inbox, Outbox বা Sent Item থেকে মুছে ফেলা সমস্ত ই-মেল এই বক্সে এসে জমা হয়। প্রয়োজন হলে এই মেলগুলি ট্রাস (Trash) থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়।
- **Reply** ঃ কোনো ই-মেলের যদি উত্তর দিতে হয় তাহলে ইনবক্স থেকে ওই মেলটি খুলে Reply বাটনে ক্লিক করলে ওই মেলের সঙ্গেই উত্তর লেখার জন্য জায়গা পাওয়া যায়। এরপর উত্তর টাইপ করে send বাটনে ক্লিক করলে উত্তরটি মেল প্রাপকের কাছে চলে যায়।

- **Forward** ঃ কোনো ই-মেল যে অবস্থায় এসেছে ঠিক সেই অবস্থায় অন্য কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন হলে ওই মেলটি খুলে Forward বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর To ঘরে প্রাপকের e-mail Id টি লিখে send বাটনে ক্লিক করলে মেলটি প্রাপকের অ্যাড্রেসে ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে।

৭.৪.৩.৩ ই-মেল প্রেরণ পদ্ধতি (Process of Sending E-mail)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেল পাঠানোর পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি হল—

(ক) কম্পিউটারকে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

(খ) নির্দিষ্ট ব্রাউজার যেমন Google Chrome বা Internet Explorer বা Mozilla Firebox ওপেন করতে হবে।

(গ) ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বক্সে (Address box) নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট, ধরা যাক www.gmail.com লিখে Enter প্রেস করতে হবে।

(ঘ) এবার আগের চিত্রের প্রথম ফাঁকা টেক্সট বক্সে e-mail Id এবং নীচের ফাঁকা বক্সে বৈধ Password টি লিখে sign in বাটনে ক্লিক করলে ই-মেল অ্যাকাউন্ট খুলে যাবে।

(ঙ) এরপর প্রাপ্ত স্ক্রিনের COMPOSE বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(চ) এখানে TO ফিল্ডে প্রাপকের e-mail Id টি লিখতে হবে। যদি ওই একই মেলের প্রতিলিপি অন্য কোনো ব্যক্তিকে পাঠাতে চাই তবে CC ও BCC ফিল্ডে তাদের e-mail Id গুলি লিখতে হবে। এরপর নীচের subject ফিল্ডে চিঠির বিষয়বস্তু এবং নীচের ফাঁকা স্থানে চিঠির বয়ান টাইপ করতে হবে।

(ছ) ই-মেলটির সাথে যদি কোনো ফাইল attach করতে হয় তাহলে Attachment বাটনে ক্লিক করে Choose File ডায়ালগ বক্স থেকে যে ফাইলটি attach করতে হবে সেটিকে সিলেক্ট করতে হবে। Gmail স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাইলটিকে আপলোডিং করতে শুরু করবে এবং আপলোডিং শেষ হলে ওই ফাইলের নামটি নীচের টেক্সট বক্সে দেখা যাবে।

(জ) এরপর নীচে send বাটনে ক্লিক করলে ই-মেলটি প্রাপকের নিকট পৌঁছে যাবে।

ই-মেল পড়া (Reading Email)

কোনো ইমেলকে পড়তে হলে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) e-mail Id ও Password এর সাহায্যে ই-মেল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে Inbox-এ ক্লিক করতে হবে। Inbox-এ সঞ্চিত সমস্ত মেলগুলির একটি লিস্ট দেখা যাবে।

(খ) যে মেলটি দেখতে হবে সেটির ওপর ক্লিক করলে মেলটি খুলে যাবে। এই মেলের সঙ্গে যদি কোনো attachment থাকে তাহলে তা Paper clip-এর আকারে মেল হেডারের বাঁদিকে প্রদর্শিত হবে।

৭.৪.৩.৪ শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থায় ই-মেল এর ভূমিকা (Importance of E-mail in Teaching Learning Process)

শিক্ষণ-শিখনে ই-মেলের গুরুত্ব অপরিসীম। নীচে এই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

(ক) ই-মেলের মাধ্যমে শিক্ষণ শিখনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। তথ্য সরবরাহকারীর কাছে ই-মেল পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুরোধ করলে তিনি তা ই-মেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

(খ) গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান করা যেতে পারে।

(গ) ই-মেলের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেকোনো সময় যে কোনোও বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থী পঠন পাঠনের কোনো বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে ই-মেলের সাহায্যে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার কথা জানাতে পারে এবং শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত ই-মেলে সেই সমস্যার সমাধান পেতে পারে।

(ঙ) শিক্ষার্থী বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সঙ্গে ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে তার গবেষণার বিষয়ে নতুন পথের দিশা লাভ করতে পারে।

(চ) ইন্টারনেট ও ই-মেলের মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থী অনেক বেশি সক্রিয় ও গঠনমুখী হয়ে উঠতে পারে।

(ছ) ইন্টারনেট ও ই-মেলের মাধ্যমে শিক্ষায় যে বাধাগুলি থাকে না, সেগুলি হল—

শ্রেণিকক্ষের আকার, শিক্ষার্থীর শিখনের গতি, শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পাঠ, প্রয়োজনীয় তথ্যের স্বল্পতা ইত্যাদি।

৭.৪.৪ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার জন্য পাসওয়ার্ডের ধারণা (Concept of Password for Network Security)

নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কম্পিউটারের তথ্যের যথাযথ সুরক্ষার ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডের ব্যবহারই সর্বাধিক প্রামাণ্য বলে ধরা হয়। কোনো একজন ব্যক্তি বা সংস্থার তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা অনুমতি ছাড়া যাতে সংগ্রহ, নষ্ট বা অসদ্ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য নেটওয়ার্কে ব্যক্তি বা সংস্থার পাসওয়ার্ড খুবই জরুরি। যেকোনো সংস্থার কাছে তার ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করার সময় পাসওয়ার্ডের সুরক্ষা ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। পাসওয়ার্ড হল এমন একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বিশেষ কোডের মাধ্যমে তথ্য ভাণ্ডারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তথ্য ভাণ্ডার অ্যাকসেস (Access) করতে গেলে যে নির্দিষ্ট কোড দ্বারা তথ্যভাণ্ডার লক্‌ড (locked) আছে সেই কোডটিই ব্যবহার করে Unlocked করতে হবে। এই কোড বা পাসওয়ার্ড একমাত্র বৈধ ইউজারই (user) জানবেন। যে সকল ইউজারের e-mail, facebook ইত্যাদি অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করার জন্য একটি করে পাসওয়ার্ড থাকে। যখন কোনো ATM কার্ড ইউজার ATM কার্ড ব্যবহার করে তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলে সেই সময় তাকে একটি PIN (Personal Identification Number) ইনপুট করতে হয় যেটি একটি পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ডটি সঠিক হলে তবেই ওই ব্যক্তি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার অনুমতি পায়। অপর কোনো অসাধু ব্যক্তি এই পাসওয়ার্ড কোড জেনে গেলে ATM কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তাকে নিঃস্ব করে দিতে পারে। সুতরাং সঠিক পাসওয়ার্ডের এবং তা সুরক্ষিত রাখার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাসওয়ার্ড হিসেবে কী ধরনের কোড ব্যবহার করা হয় তার ওপর নির্ভর করে পাসওয়ার্ডকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন weak password এবং strong password।

Weak Password ঃ যে সমস্ত পাসওয়ার্ড খুব সহজেই অনুমান করা যায় সেগুলিকে weak password বলা হয়। এই ধরনের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় না। অনেকে পাসওয়ার্ড মনে রাখতে না পারার কারণে পাসওয়ার্ড লিখে রাখে। ফলস্বরূপ এই সমস্ত পাসওয়ার্ডের অন্যের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যে কারণে এই ধরনের পাসওয়ার্ডও Weak password-এর শ্রেণিভুক্ত হয়। অনেক ব্যবহারকারী স্মরণে রাখার জন্য পাসওয়ার্ড হিসেবে পরিবারের কারো নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি ব্যবহার করে। তবে এক্ষেত্রে জেনে রাখা দরকার, যে সমস্ত অসাধু ব্যক্তি বা সংস্থা এই পাসওয়ার্ড ব্রেক (Break) করার কাজ করে তারা ব্যবহারকারীর সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য তাদের ডেটাবেসে সঞ্চিত রাখে। সুতরাং এই ধরনের পাসওয়ার্ড ও weaker শ্রেণির মধ্যেই পড়ে।

Strong Password ঃ যে সমস্ত পাসওয়ার্ডের ক্যারেকটারের সংখ্যা অনেক বেশি এবং অনুমান করা শক্ত অর্থাৎ যে সমস্ত পাসওয়ার্ডগুলিতে জটিল ধরনের সংকেত ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে strong password বলা হয়। দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে এবং জটিল সংকেত থাকায় এই ধরনের পাসওয়ার্ড ব্রেক করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। সাধারণভাবে strong password এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(ক) দৈর্ঘ্য কমপক্ষে 8 থেকে 15 ক্যারেকটার বিশিষ্ট হলে ভালো হয়।

(খ) এই ধরনের পাসওয়ার্ড ছোটো ও বড়ো হাতের অক্ষর, সংখ্যা (0-9) এবং স্পেশাল ক্যারেকটারের (!, @, #, $, %, ∧ ইত্যাদি) সংমিশ্রণে তৈরি করা যেতে পারে।

(গ) পাসওয়ার্ডে এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যা একমাত্র ব্যবহারকারীই জানে, কোনো ব্যক্তিগত তথ্য নয়।

(ঘ) পাসওয়ার্ডে যেন কোনো ধারাবাহিক অ্যালফাবেট বা সংখ্যা না থাকে।

(ঙ) পাসওয়ার্ডে এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যা অন্য কাউকে জানানো যাবে না।

(চ) পাসওয়ার্ডে এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যা কখনোই কোথাও সরাসরি লিখে রাখা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

- ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) হল ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকা লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের একত্রীকৃত তথ্যাদি অ্যাকসেস করার জন্য আর্কিটেক্টচারাল ফ্রেম ওয়ার্ক (architectural frame work)। এর জনক হলেন টিম বানার্স লি।
- দুই বা ততোধিক মেশিন যখন একত্রে যুক্ত হয়ে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং তথ্য আদান প্রদান করে তখন সেই ব্যবস্থাকে নেটওয়ার্ক বলা হয়।
- নেটওয়ার্ক যখন গেটওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ পরিসেবার সুবিধা দেয় তখন সেই সিস্টেমকে ইন্টারনেট ওয়ার্ক বা সংক্ষেপে ইন্টারনেট (Internet) বলা হয়।
- ব্রাউজার হল এক বিশেষ ধরনের সফটওয়ার প্রোগ্রাম যার সাহায্যে খুব সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধানের কাজ করা যায়। কতকগুলি পপুলার ওয়েব ব্রাউজার হল Internet Explorer, Mozilla Fire Fox ইত্যাদি।
- সার্চ ইঞ্জিন হল একটি টুল যা WWW তে তথ্য খোঁজার কাজে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি পপুলার সার্চ ইঞ্জিন হল Google, MSN, Yahoo ইত্যাদি।
- ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে প্রেরিত ইলেকট্রনিক বার্তাই হল ই-মেল (e mail)। একটি সম্পূর্ণ e mail-Id র দুটি অংশ থাকে, যেমন ইউজার নেম ও ডোমেন নেম।
- পাসওয়ার্ড হল এমন একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বিশেষ কোডের মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়। পাসওয়ার্ডে কী ধরনের কোড ব্যবহার করা হয় তার উপর নির্ভর করে পাসওয়ার্ডকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল weak password এবং strong password.

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

Internet, World Wide Web, Browser, Search Engine, Protocol, Uniform Resource Locator, E-mail, MODEM, Hypertext Transfer Protocol, Download, Upload, Surfing, Websites, Webpage, Password ARPANET, Post Office Protocol.

অনুশীলনী (Exercises)

(১) WWW বলতে কী বোঝায়?

(২) WWW-র সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

(৩) সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে লেখ।

(৪) ব্রাউজিং বলতে কী বোঝায়?

(৫) ইন্টারনেট পরিসেবার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যারগুলি কী কী?

(৬) ইন্টারনেটের ব্যবহারগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৭) ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য ডাউনলোডের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(৮) শিক্ষা শিখনে ওয়েবের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

(৯) ই-মেল কী? ই-মেলের বিভিন্ন সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

(১০) ই-মেল অ্যাড্রেস কী? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

(১১) শিক্ষণ শিখনে ই-মেলের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখ।

(১২) নেটওয়ার্ক সুরক্ষায় পাসওয়ার্ডের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(১৩) সম্পূর্ণ রূপ লেখ ঃ

WWW, TCP/IP, ISP, DNS, HTML, HTTP, E-mail, URL, FTP, SMTP, POP।

(১৪) টীকা লিখ ঃ

ইন্টারনেটের ইতিহাস, URL, E-mail, Domain Name, ওয়েবব্রাউজার।

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করো এবং সেখান থেকে D.EI.Ed-এর কারিকুলাম ডাউনলোড কর।

(২) State Council of Educational Research and Training, West Bengal এর ওয়েব সাইটটি ব্রাউজ করে পশ্চিমবঙ্গের D.I.E.T গুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কর (যেমন D.I.E.T-এর সংখ্যা, অবস্থান, পরিকাঠামো, কার্যকলাপ ইত্যাদি)।

(৩) একটি ই-মেল অ্যাকাউন্ট তৈরি কর।

(৪) নিজস্ব ই-মেল অ্যাকাউন্ট থেকে বন্ধুকে একটি অ্যাটাচমেন্ট সহ মেল পাঠাও।

(৫) ইন্টারনেট থেকে একটি পছন্দের ছবি সার্চ করে কম্পিউটারে তা ডাউনলোড কর।

অধ্যায়

৮

কম্পিউটারের সুরক্ষা

৮.১ কম্পিউটার ভাইরাসের প্রাথমিক ধারণা (Basic Concept of Computer Virus)

কম্পিউটার ভাইরাস হল এক ধরণের অনিষ্টকারী সফটওয়ার বা প্রোগ্রাম যা কোনও ভাবে কম্পিউটারে অ্যাটাক করলে ওই কম্পিউটারের মেমরীতে সঞ্চিত ডাটা এবং অন্যান্য ফাইল প্রোগ্রামকে বিনষ্ট করে কম্পিউটারের কাজের বিঘ্ন ঘটায়। শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে এর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বাড়তে বাড়তে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ডেটাবেসকে বা কম্পিউটারে রাখা হিসেব নিকাশের পরিবর্তন করে বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতিও করে দিতে পারে। ভাইরাস কম্পিউটারে অ্যাটাক করার বিভিন্ন উপায়গুলি হল—

- কোনও একটা ভাইরাস আক্রান্ত ফাইলকে ওপেন করা।
- কোন ভাইরাস আক্রান্ত প্রোগ্রামকে মেশিনে রান করা।
- মেশিনে ভাইরাস আক্রান্ত কপি, সিডি বা পেনড্রাইভ ইত্যাদি ব্যবহার করা।
- অনেক সময় পাইরেটেড সফটওয়ার ও ভাইরাস অ্যাটাকের মাধ্যম হতে পারে।
- ইন্টারনেট বা ইমেলের মাধ্যমে কম্পিউটারে ভাইরাস অ্যাটাক ঘটতে পারে।
- ইমেল অ্যাটাচমেন্ট হল কম্পিউটারে ভাইরাস ছড়াবার সব চাইতে বড়ো সহজ রাস্তা।

কম্পিউটার ভাইরাসের প্রথম ধারণা দেন David Gerroldi, যদিও ভাইরাস সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেন John Brunner. তিনি তাঁর বইতে ভাইরাসকে ওয়ার্ম (Warm) নামে অভিহিত করেন। ১৯৮৩ সালে University of Cincinnati এর অধ্যাপক Fred Cohen প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করেন। এই অধ্যায়টি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যাবে ঃ

- কম্পিউটারের ভাইরাস কী এবং তা কীভাবে কম্পিউটারের ক্ষতিসাধন করে সেই সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।
- কম্পিউটার ভাইরাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানা যাবে।
- ফায়ারওয়াল (Firewall) কী, তার প্রকারভেদ এবং ফায়ারওয়ালের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যাবে।
- কম্পিউটারের নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টিভাইরাস কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

৮.২ কম্পিউটার ভাইরাসের প্রকারভেদ (Different Types of Computer Virus)

কম্পিউটার ভাইরাসকে তার ক্ষমতা ও আক্রমণ করার জায়গা অনুযায়ী কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বুট সেক্টর ভাইরাস (Boot Virus) : এই ভাইরাস বুট সেক্টরকে আক্রমণ করে এবং কম্পিউটার বুট করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের বিকৃতি ঘটায়।

পার্টিশন টেবিল ভাইরাস (Partition Table Virus) : এই ধরণের Virus পার্টিশন টেবিল সেক্টরে আক্রমণ করে। কম্পিউটার বুটিং হওয়ার সময় এই ভাইরাসগুলি Active হয়।

ফাইল ভাইরাস (File Virus) : এই ধরণের ভাইরাসগুলি সাধারণত com এবং exe ফাইলগুলিকে আক্রমণ করে। যখন কোনো ফাইল এক্সিকিউট করা হয় তখনই ওই ভাইরাস সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মাল্টি পারাটাইট ভাইরাস (Multi Paratite Virus) : এই প্রকার ভাইরাস ফাইল ও বুট সেক্টরে একসঙ্গে আক্রমণ করে।

ম্যাক্রো ভাইরাস (Macro Virus) : এই ধরণের ভাইরাস সাধারণত ডকুমেন্টের মধ্যে থাকে।

৮.৩ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Virus)

কম্পিউটার ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিলিপি গঠন (Capacity to reproduce automatically)

কম্পিউটারে বাইরে থেকে ভাইরাস অ্যাটাক করার পর ভাইরাসের প্রাথমিক কাজ হল বহু সংখ্যক নিজের প্রতিলিপি গঠন করা এবং সেগুলিকে কম্পিউটারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। অনেক সময় দেখা যায় কম্পিউটার ভাইরাস অপরেটিং সিস্টেমের ফাইলগুলিতে সংক্রমণ ঘটায় এবং যখনই অপরেটিং সিস্টেম চালু হয় তখন কম্পিউটার নিজে থেকে সংক্রমিত হতে শুরু করে।

অন্য কম্পিউটারে প্রেরণ করা (Migrate towards other Computers)

একটি কম্পিউটার থেকে কোনো ডাটা, CD, পেন ড্রাইভ, ফ্লপি, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি অন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করলে তথ্যের সঙ্গে ভাইরাস ও অন্য কম্পিউটারে কপি হয়ে যায়। অন্য দিকে LAN, WAN, Internet এর মাধ্যমে ও ভাইরাস প্রেরিত হয়।

প্রতিষেধককে প্রতিরোধ করা (Resistance to vaccines)

সাধারণত অ্যান্টিভাইরাসগুলি হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে ভাইরাসগুলি কম্পিউটারের মেমোরিতে অবস্থান করে বা কম্পিউটার সিস্টেমের বসবাসকারীতে পরিণত হয়। তাই অ্যান্টি ভাইরাস দ্বারা বিভিন্ন ফাইল বা ডকুমেন্টের ভাইরাসের প্রতিলিপি দূর করা গেলেও কম্পিউটারের সংক্রমণ থেকেই যায়।

ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক কাজ (Destruction or harmful actions)

একটি কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর অনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্ষতিকারক কাজ করে থাকে। যেমন কখনও কম্পিউটার Hang করে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলা, তথ্য বিকৃতি ঘটানো, প্রিন্টার অচল করে দেওয়া, CPU এর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি।

৮.৪ কম্পিউটারে ফায়ালওয়াল সুরক্ষা (Firewall Protection in Computer)

ফায়ারওয়াল হল পুরাতন মধ্যযুগীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিক কারিগরী রূপ, অর্থাৎ প্রাসাদের মধ্যে একটি পরিখা তৈরি করে রাখার মতো। প্রত্যেক প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং বাহির হতে হলে একটি ব্রিজের উপর দিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিবারই প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার সময় সিকিউরিটি বা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এই একই পন্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব। ধরাযাক, একটি কোম্পানি LAN এ যুক্ত রয়েছে এবং ওই কোম্পানি থেকে তথ্য আসা যাওয়ার সময় অবশ্যই কোনো সিকিউরিটি বা ইলেকট্রনিক ব্রিজের মাধ্যমে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ওই ইলেকট্রনিক ব্রিজটিই হল ফায়ারওয়াল (Firewall)। সুতরাং বলা যায়, ফায়ারওয়াল (Firewall) হল একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সুরক্ষা মাধ্যম যা কোনো কম্পিউটারে অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবেশ করতে বা কোনো তথ্য গ্লোবাল নেটওয়ার্কে পাঠাতে হলে তা যাচাই করে দেখে। ফায়ারওয়ালের ব্যবহারে নিজস্ব নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত থাকে, কারণ ডাটা বা তথ্যের আসা-যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ফায়ারওয়াল। এই কারণে ফায়ারওয়াল বর্তমানে একটি জনপ্রিয় নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

উপরের ধারণা অনুযায়ী ফায়ারওয়ালের দুটি উপাদান আছে— ফিল্টার (Filter) এবং এ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে (Application gateway)।

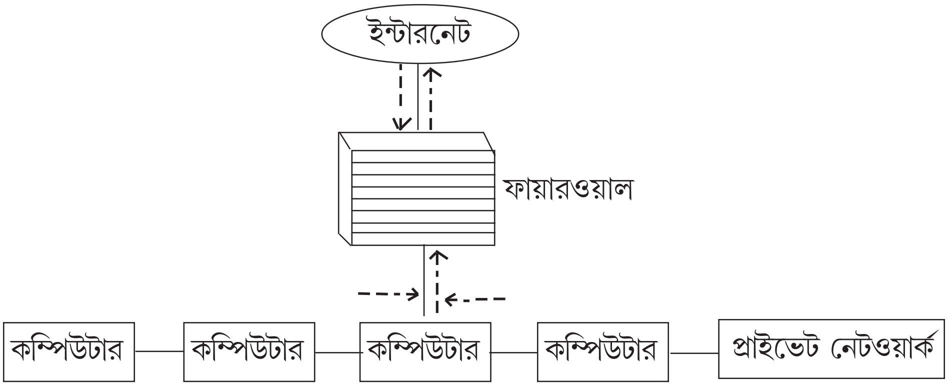

চিত্র ৮.১ : ফায়ারওয়াল সুরক্ষা

নীচের চিত্রে ফায়ারওয়ালের আভ্যন্তরীণ গঠন ও তার কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে।

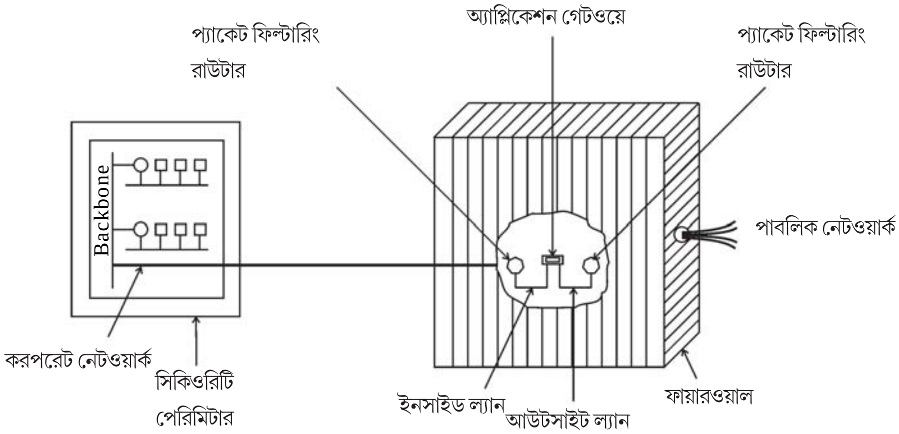

চিত্র ৮.২ : ফায়ারওয়ালের আভ্যন্তরীণ গঠন

সাধারণত তিন ধরণের ফায়ারওয়াল দেখা যায়—যেমন প্যাকেট লেবেল ফায়ারওয়াল,অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ফায়ারওয়াল ও সার্কিল লেবেল ফায়ারওয়াল। নিম্নে এগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

(ক) **প্যাকেট লেবেল ফায়ারওয়াল :** এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে পরিবাহিত (আগত ও নির্গত) ডেটা প্যাকেটগুলি নিরাপত্তার নীতি অনুসারে গন্তব্য নেটওয়ার্কে যেতে পারে কিনা তা ফিল্টার করে দেখাই হল প্যাকেট লেভেল ফায়ারওয়ালের প্রধান কাজ। যেমন—চেক পয়েন্ট ফায়ারওয়াল হল একটি প্যাকেট লেভেল ফায়ারওয়াল।

(খ) **অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ফায়ারওয়াল :** অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেনস্টেশনের ডেটা বিশ্লেষণ করতে এবং পরিস্রুত করতে পারে এই ধরনের ফায়ারওয়াল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো Mobile এ আগত বা নির্গত মেসেজের হেডার ফিল্ড, মেসেজ আকৃতি, বিষয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করে যে অ্যাকশন নেওয়া হয় তার উপর ভিত্তি করে মেসেজটি পাঠানো হবে কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে বা ফায়ারওয়াল। ওয়েব প্রক্সি (Web proxy), মেইল সার্ভার (Mail Server) হল অ্যাপ্লিক্যাশন লেভেল ফায়ারওয়ালের উদাহরণ।

(গ) **সার্কিট লেভেল ফায়ারওয়াল :** এই ধরনের ফায়ারওয়াল অনেকটা অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ফায়ারওয়ালের মতো। সার্কিট লেভেল ফায়ারওয়াল কোনো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হলে সেটি একবার পরখ করে নেয় এবং নিরাপত্তার নিয়ম অনুসারে একবার যুক্ত হলে তখন আর দ্বিতীয়বার ডাটা পরখ করে না। যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাটা বা তথ্যের আদান প্রদান ঘটে, সেই নেটওয়ার্কের সুরক্ষা পরখ করে বলে এই ধরনের ফায়ারওয়াল সার্কিট লেভেল ফায়ারওয়াল নামে পরিচিত।

৮.৪.১ ফায়ারওয়াল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of using Firewall)

ফায়ারওয়াল ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুবিধা ঃ

- ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ প্রাইভেট নেটওয়ার্ককে সুরক্ষিত করা যায়।
- স্পর্শকাতর, গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করা যায় ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে।
- ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের পরিসংখ্যান রাখাও সম্ভব হয়।

অসুবিধা ঃ

- নেটওয়ার্কের মধ্যে ফায়ারওয়াল প্রতিস্থাপনের অর্থাৎ কনফিগারেশনের জটিলতা থাকায় এই কাজে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া ফায়ারওয়াল প্রতিস্থাপন করা যায় না।
- ফায়ারওয়াল ব্যবহারের প্রকৃত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ব্যয়বহুল হওয়ায় ছোটখাট সংস্থা এটি ব্যবহার করে না।
- ফায়ারওয়ালের সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে অর্থাৎ এটি সার্বজনীনভাবে জ্ঞাত নয়, ফলে বহুল ব্যবহৃত নয়।

৮.৫ অ্যান্টিভাইরাসের ব্যবহার (Uses of Anti Virus)

প্রথম অ্যান্টিভাইরাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল শুধুমাত্র কম্পিউটার থেকে ভাইরাস রিমুভ (Remove) করতে, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরাস, কম্পিউটারের ভাইরাস ছাড়াও ওয়ার্মস (Worms), ফিসিং অ্যাটাক (Phishing Attacks), রুটকিটস (Rootkits) প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সেগুলিকে কম্পিউটার থেকে রিমুভ করতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করলেই চলবে না, প্রতিনিয়ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা আপডেট (Update) করতে হবে। আপডেট করলে অ্যান্টিভাইরাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এর স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় থাকে।

অ্যান্টিভাইরাস কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে ভাইরাসগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে। সেগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সিগনেচার বেসড ডিটেকশান (Signature Based Detection)

এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি ভাইরাস ডিটেকশান হয়। এই ভাইরাল সিগ্‌নেচারকে বলা হয় ভাইরাল কোড (Viral code)। যদি কোনো ফাইলকে স্ক্যান করার সময় এই ভাইরাল কোড খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে প্রধানত তিনটি ধাপে অ্যান্টিভাইরাস ডিটেকশানের কাজ সম্পূর্ণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ধাপগুলি হল কোয়ার‍্যানটিনিংগ (Quarantining), রিপেয়ারিং (Repairing) এবং ডিলিটিং (Deleting)।

প্রথমে অ্যান্টিভাইরাস ফাইলটিকে ইনঅ্যাক্সসিবল (Inaccessible) করে দেয়। ফাইলটিকে এনক্রিপ্ট করা হল কোয়ার‍্যানটিনিঙ্গ এর কাজ। যদি ব্যবহারকারী ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া ফাইলকে সেভ করতে চায়, তখন অ্যান্টিভাইরাস ফাইলটিকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করে। রিপেয়ার না হলে অ্যান্টিভাইরাস ফাইলটিকে ডিলিট করে দেয় এবং এইভাবে ভাইরাস অ্যাটাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

হিউরিসটিক বেসড ডিটেকশন (Heuristic Based Detection)

হিউরিসটিক বেসড ডিটেকশানে দুইটি পদ্ধতি, যেমন—ফাইল বিশ্লেষণ ও ফাইল ইমুলেশন এর মাধ্যমে ভাইরাস শনাক্ত করা হয়।

ফাইল বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যান্টিভাইরাস কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে অবস্থিত নির্দেশকে বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলতে পারে প্রোগ্রামটি ভাইরাস আক্রান্ত কিনা। ফাইল ইমুলেশন পদ্ধতিতে প্রথমে ফাইলটিকে একটি ভারচুয়াল (Virtual) সিস্টেম এনভায়রনমেন্টের মধ্যে চালানো হয় এবং ফাইলটির কার্যকলাপের উপর নজর রাখা হয়। ফাইলটির ইনসস্ট্রাকশনের কাজ ক্ষতিকারক মনে হলে ফাইলটি ভাইরাস যুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়।

বিহেবিয়ারল বেসড ডিটেকশন (Behavioural Based Detection)

এই পদ্ধতিতে সকল প্রকার প্রোগ্রামের মনিটর করা হয়। যদি কোনো প্রোগ্রাম এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রামের মধ্যে ডেটা লিখতে চেষ্টা করে তাহলে অ্যান্টিভাইরাস সেই প্রোগ্রামটিকে ভাইরাস বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া ডেটা মাইনিং টেকনিকসে ও অ্যান্টিভাইরাস ভাইরাস ডিটেকশন করে।

'Prevention is beter than cure' — এটি একটি প্রচলিত কথা। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এটি সমানভাবে প্রযোজ্য, কাজেই ভাইরাস আক্রমনের আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বাজারে বিভিন্ন ধরনের Antivirus সফটওয়ার পাওয়া যায়, এদের মধ্যে কতগুলি হল—Norton, Netwhield, Quick Heal, Avast ইত্যাদি। এই সফটওয়ারগুলি ইনস্টল করে নিয়মিত ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপডেট করতে হবে। এর সঙ্গে কতগুলো কথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন—

- কোনো নতুন ফ্লপি, ডিস্ক, পেনড্রাইভ ব্যবহার করলে প্রথমেই তা কম্পিউটারে স্ক্যান করে নিতে হবে।
- কোনো অচেনা জায়গা থেকে তথ্য এলে সতর্ক হয়ে খুলতে হবে।
- প্রতিদিনই ইন্টারনেট খোলার পর অ্যান্টিভাইরাস চালাতে হবে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমের ডাটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

- ভাইরাস একটি সফটওয়ার প্রোগ্রাম কোড যার আক্রমনে কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েও যায়। প্রথম ভাইরাসের ধারণা দেন Devid Gerroldi।
- ভাইরাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিলিপি গঠন, একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে প্রেরণ, প্রতিষেধককে প্রতিরোধ করা এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে কম্পিউটারের ক্ষতিসাধন করা।
- Firewall হল একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ব্যবস্থা যা কম্পিউটারে অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবেশ করতে বা কোনো তথ্য গ্লোবাল নেটওয়ার্কে পাঠাতে হলে যাচাই করে দেখে।
- অ্যান্টিভাইরাস হল একটি সফটওয়ার প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Key Words)

Computer Virus, Firewall, Antivirus ।

অনুশীলনী (Exercises)

(১) ভাইরাস কী? ভাইরাসকে তার ক্ষমতা এবং আক্রমনের জায়গা অনুযায়ী কটিভাগে ভাগ করা যায়?

(২) ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

(৩) অ্যান্টিভাইরাস কাকে বলে? অ্যান্টিভাইরাসের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(৪) Firewall কী? Firewall কীভাবে কাজ করে তা ছবির সাহায্যে বর্ণনা কর।

প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work)

(১) অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটার ল্যাবের কোন একটি কম্পিউটার এবং রিমুভেবেল ড্রাইভ স্ক্যান কর।